১০ই নভেম্বর স্মরণে

মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার

৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

১০ই নভেম্বর স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় /০৪

প্রবন্ধঃ স্মৃতি তর্পণ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উপর গৃহীত শোক প্রস্তাব/৬
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলন ☐ সত্যবীর দেওয়ান/০৮
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ নবজাগরণের বাণী ☐ শরৎ জ্যোতি চাকমা/১১
মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ☐ পাভেল পার্থ/১৪
মহান নেতা এম এন লারমা ঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা ☐ ধীর কুমার চাকমা/১৯
এম এন লারমার সংগ্রাম ঃ নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ও করণীয় ☐ বিনয় কুমার ত্রিপুরা/২৩

প্রবন্ধঃ অধিকার ও সংগ্রাম
পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের মাধ্যমে এর সমাধান ☐ মঙ্গল কুমার চাকমা/২৬

কবিতা
৮৩ ফিরি এজে ☐ নিতীষ চাকমা/৩২
ভুলি নাই ভুলবো না তোমাকে ☐ জড়িতা চাকমা/৩৩

বিশেষ প্রতিবেদন
পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের নিপীড়ন-নির্যাতন/৩৪
সরকারের কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ ও পার্বত্যবাসীর আপত্তি/৩৯

সংবাদ প্রবাহ
জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা/৪১
সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল/৪৪
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন/৪৫
সাংগঠনিক সংবাদ/৫০

সম্পাদকীয়

আজ ১০ নভেম্বর ২০১৬ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে বিভেদপন্থী, জাতীয় কুলাঙ্গার, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমা। সেদিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাপুরুষোচিত সশস্ত্র আক্রমণে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে বরণ করেছেন পানছড়ি আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রবাস লারমা, মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারী পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি), সার্জেন্ট সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা (অর্জুন)। বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত মহান নেতাসহ এই আট বীর বিপ্লবী সেনানীকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম।

প্রতি বছর ১০ নভেম্বর এসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মহান বিপ্লবী নেতা এম এন লারমা মৃত্যুঞ্জয়ী, তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও জীবনাদর্শের মৃত্যু নেই। অপরদিকে জুম্ম জাতির প্রাণের মানুষ, পথপ্রদর্শক এবং প্রগতিশীল ও মেহনতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সিক্ত এই নেতাকে হত্যা করে সেই বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারী জুম্ম জাতির ইতিহাসের কলঙ্ক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রকে স্থান নিতে হয়েছে ইতিহাসের গ্লানিময় আস্তাকুঁড়ে। বলাবাহুল্য, জুম্ম জাতির নেতা হিসেবে, মেহনতি মানুষের বন্ধু হিসেবে, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপোষহীন সংগ্রামী হিসেবে, মানবদরদী এক মানুষ হিসেবে, প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র বিষয়ে সচেতন একজন ব্যক্তি হিসেবে, একজন সাংসদ ও জাতীয় নেতা হিসেবে, অধিকারহারা ও নিপীড়িত জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে, সর্বোপরি দূরদর্শী এক বিপ্লবী দার্শনিক ও নেতা হিসেবে তিনি যে সংগ্রামী জীবনাদর্শ স্থাপন করে গেছেন, পথনির্দেশ করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জুম্ম সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামে এবং জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাঁর সমগ্র জীবনকেই তিনি দ্বিধাহীনভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই সমগ্র জুম্ম জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রসর হয়। তাঁর গভীর দূরদর্শিতায় জুম্ম জাতির অবহেলিত মেহনতি মানুষ গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে জুম্ম সমাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামে এগিয়ে আসে। বলাবাহুল্য এম এন লারমার চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শ কেবল সাধারণভাবে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও বরণীয় বিষয় নয়, এটি আজকের দিনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং যে কোন অধিকার হারা জাতি ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও অপরিহার্য।

এম এন লারমার চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শ কেবল সাধারণভাবে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও বরণীয় বিষয় নয়, এটি আজকের দিনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং যে কোন অধিকার হারা জাতি ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও অপরিহার্য।

১০ নভেম্বর বারবার এই শিক্ষাও আমাদের দিয়ে যায় যে, যে মানুষটি ঘুমন্তপ্রায় মানুষের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করেন, স্বপ্নহীন মানুষকে দেখিয়েছিলেন নতুন দিনের স্বপ্ন, সামন্তীয় ও বিজাতীয় শাসন-শোষণে পিষ্ট দিশাহীন মানুষকে যুগিয়েছেন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা, যে মানুষটি পরম স্নেহ-মমতা ও ধৈর্য্য দিয়ে মানুষকে ক্ষমা ও মানবতার দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার বোধ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, সেই মানুষকেই বিভেদপন্থী,

ষড়যন্ত্রকারী ও ক্ষমতালোভীরা বিবেক, বোধশক্তি ও মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে কত সহজে হত্যা করতে পারলো! কী অপরিণামদর্শিতা ও অকৃতজ্ঞতায় তারা আপন নেতাকে হত্যা করতে পারে, জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতির অগ্রসরমান আন্দোলনের কোমরে ছুরিকাঘাত করতে পারে! ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে এই বিভেদপন্থী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির (জনসংহতি সমিতি) সর্বময় ক্ষমতা দখলের এক ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র চালায়। কিন্তু পার্টির বিশ্বস্ত ও ত্যাগী নেতাকর্মীরা তা হতে দেয়নি। এক পর্যায়ে মহান নেতা 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও পার্টির স্বার্থে সবাইকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দেন। কিন্তু ক্ষমতালোভে মদমত্ত আদর্শচ্যুত ষড়যন্ত্রকারীরা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই তারা জুম্ম জাতির ইতিহাসের জঘন্যতম কালো অধ্যায় ১০ নভেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত করে থাকে।

বলাবাহুল্য, সেদিন যদি মহান নেতার অনুজ, যোগ্য উত্তরসূরী, জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারি, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী সহযোদ্ধা, মেহনতি মানুষের আরেক পরম বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ না করতেন এবং সংগ্রামের হাল ধরতে এগিয়ে না আসতেন তাহলে জুম্ম জাতি ও তাদের আন্দোলন চরম অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হতো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, অসীম ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অপরিমেয় সাহসিকতায় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পার্টি পুনঃসংগঠিত হতে এবং তৎকালীন সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যেও বিভেদপন্থীদের জাতিবিধ্বংসী ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সক্ষম হয়। বলতে গেলে, তাঁর নেতৃত্বে পার্টি আবারও সত্যিকারের জনগণের পার্টি, জুম্ম জাতির পার্টি ও বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের কারণেই পার্টি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, এরপরও আমরা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে চুক্তি বিরোধীতার নামে ইতিহাস ও নেতৃত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ পার্টি ও পার্টির নেতৃত্বকে অবমূল্যায়ণ করে নতুন রূপে সেই বিভেদপন্থীদের অশুভ ও প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের কালো হাত প্রসারিত হতে দেখতে পাই। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের পথে সৃষ্টি হয় এক গভীর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধকতা। '৮৩-র বিভেদপন্থীদের 'দ্রুত নিষ্পত্তি'র ন্যায় দেখা দেয় বিভেদপন্থার নতুন এক ষড়যন্ত্র তথাকথিত 'সংস্কার' বা 'সংস্কারপন্থী' তত্ত্ব। ষড়যন্ত্রকারীরা পার্টির নেতৃত্বকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু এবারেও পার্টি ও পার্টির প্রগতিশীল নেতৃত্ব সেই ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা রুখে দিতে সক্ষম হয়। বলাবাহুল্য, বর্তমান সময়েও সেই বিভেদপন্থা ও ষড়যন্ত্রের রেশ কাটেনি। তাই এই ১০ নভেম্বরেও পার্টি ও পার্টির নেতাকর্মী এবং সংগ্রামী জনগণকে সেই ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যে ইস্পাত কঠিন দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আজ ঊনিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। সম্প্রতি সরকার জাতীয় সংসদে জুম্ম জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ও অচলাবস্থার পর "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিল (সংশোধন) ২০১৬" নামে বিলটি পাশের মধ্য দিয়ে আইনটির সংশোধন সম্পন্ন করেছে।

আইনটি যথাযথভাবে সংশোধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার অন্যতম সমস্যা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পথ এখন উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ব্যতীত পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। জুম্ম জাতির জন্মভূমির অস্তিত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে না। তাই সকল প্রকার বিভেদ, ষড়যন্ত্র এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্য অধিকতর গড়ে তুলে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটাই এই ১০ নভেম্বরে শপথ নিতে হবে এবং এম এন লারমা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উপর গৃহীত শোক প্রস্তাব

জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) মৃত্যুর ৩৩ বছর পর জাতীয় সংসদে তাঁর ওপর শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোববার বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় দশম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ অধিবেশনের প্রথম দিনের বৈঠকের শুরুতে স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী শোক প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা গৃহীত হয়। দীর্ঘ ৩৩ বছর পরে হলেও এম এন লারমার উপর শোক প্রস্তাব গ্রহণ করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জাতীয় সংসদ ও সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তা সংসদের পরের অধিবেশনের প্রথম দিন শোক প্রস্তাব আকারে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এম এন লারমা মারা যাওয়ার পর কোনো শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, যে কারণে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি সংসদের নথিতে নেই। বিষয়টি জাতীয় সংসদের নজরে আনেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙামাটি আসনের স্বতন্ত্র সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার। পরে এই অধিবেশনে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি শোক প্রস্তাব আকারে গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ব্যাপক প্রচার ও পাঠকদের জানার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গৃহীত শোক প্রস্তাব নিম্নে পত্রস্থ করা গেল- তথ্য ও প্রচার বিভাগ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শোকপ্রস্তাব

[২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় দশম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ
(২০১৬ সালের ৪র্থ) অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক উত্থাপনীয়]

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,

আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ইতোমধ্যে আমরা একজন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য এম আব্দুর রহিম, দুইজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোঃ কোরবান আলী ও মোঃ ফজলুর রহমান পটল, চারজন সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব অধ্যাপক ডাঃ এম এ মান্নান, আলী রেজা রাজু, আবদুর রাজ্জাক খান ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং সংসদ সচিবালয়ের একজন গাড়ীচালক মোঃ বিপ্লব হোসেনকে হারিয়েছি।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত শোকপ্রস্তাব আমি এ মহান সংসদে উত্থাপন করছি। শোকপ্রস্তাবের অনুলিপি আপনাদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,

কবি শহীদ কাদরী, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহারদাতা বাদী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মহিতুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেত্রী অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু মিতিল, কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলী, মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু সিডনি শনবার্গ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছদরুদ্দিন আহমদ এবং কৌতুক অভিনেতা ফরিদ আলীর মৃত্যুতে এ সংসদ গভীর শোকপ্রকাশ করছে।

এছাড়াও টঙ্গী টাম্পাকো ফয়েলস কারখানার বয়লার বিস্ফোরণে, বরিশালের বানারীপাড়ায় সন্ধ্যা নদীতে লঞ্চ ডুবিতে এবং দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোকপ্রকাশ, সকল বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

উত্থাপিত শোকপ্রস্তাবে যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম বাদ পড়ে থাকে, তবে তাঁর বা তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সংসদ সচিবালয়ে পৌছে দিলে তা পরবর্তী শোকপ্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনা করা হবে।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ

আমি এখন শোকপ্রস্তাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য মহান সংসদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
স্পীকার

তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,

আমি এখন তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুতে একটি শোকপ্রস্তাব এ মহান সংসদে উত্থাপন করছি। আশা করি, প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়াচর থানার বুড়িঘাট মৌজার মহাপুরমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার খেদারছড়ার থুম নামক স্থানে 'বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র' নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপের আক্রমণে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিএড এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন এবং তিনি এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাকশালে যোগদান করেন। ১৯৭৭ ও ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি গণপরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র, নম্র, সহানুভূতিশীল, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাদাসিদা জীবনের অধিকারী। ধৈর্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতার দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এক মানুষ। তিনি ছিলেন প্রকৃত এক মানবতাবাদী।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,

এ সংসদ প্রস্তাব করছে যে, "মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, শিক্ষক এবং নিবেদিত সমাজসেবককে হারালো। এ সংসদ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।"

এ শোকপ্রস্তাবের একটি অনুলিপি প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলন

সত্যবীর দেওয়ান

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বন্দুকভাঙ্গা-নানিয়ারচর অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্র হতে আমাকে চিঠি লেখা হয়। সম্মেলনে যোগদান করার প্রস্তুতি স্বরূপ অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী করে নিই। তৎপর আমাদের ২নং সেক্টর কমান্ডার কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করি। তৎকালীন ২নং সেক্টর আওতাধীন বিভিন্ন অঞ্চল এবং জোন প্রতিনিধিবৃন্দ সেক্টর কার্যালয়ের নির্ধারিত ঠিকানায় একত্রিত হতে জানিয়ে দেয়া হয়।

নির্ধারিত তারিখে আমি নানিয়ারচর হতে মুভাছড়ির তদানীন্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসে তৎকালীন সেক্টর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করি। সঙ্গে অবশ্যই নিজস্ব ব্যবহারিক পোশাক পরিচ্ছদ, রেকসিন, বেডসীট, মশারী, গিলাপ কাপড় ছিলো। রুখসেক ছিলো না, তাই বড় নাইলনের থলির নিচের দুই কোণায় সেলাই করে দুই কাঁধের বেল্ট লাগিয়ে যাতে পিটে বহন করা যায় এমন উপযোগী করে সেলাই করা হয়েছে। সেক্টর কার্যালয়ে বিভিন্ন জোন ও অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্রিত হই। তৎপর নির্ধারিত তারিখে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড় পর্বতময় অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কেবল হাঁটা আর হাঁটা, মাঝে মধ্যে ৫/১০ মিনিট বিশ্রাম এভাবে তিনদিন তিন রাত হেঁটে মুভাছড়ি উগুধাছড়ি মেরুং ভৈরভা পেরিয়ে দীঘিনালার জনৈক চেয়ারম্যানের বাড়িতে প্রায় রাত ১১টায় পৌছি। সেখানে বিশ্রাম ও পানীয় জল খাওয়ার পর যার যার নির্ধারিত স্থানে শুয়ে পড়ি। অবশ্য সেন্ট্রি ডিউটিতো যেখানেই যাই না কেন তা পালাক্রমে রয়েছে।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে আবার হাঁটা শুরু। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের পাতায় ইতোমধ্যে কয়েকটি ফোস্কা পড়ে ফেটে গেছে, তবু হাঁটার শেষ নেই। আরও একদিন এক রাত্রি হাঁটার পর পরের দিন সকাল ৯ টায় কেন্দ্রের নির্ধারিত ওপি-তে পৌছলাম। ওপি-তে দায়িত্বরত সদস্যগণ আমাদের সাথে করমর্দন করার পরে পানীয় জল ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তামাক খাওয়ার পর আবার ওপি-এর দায়িত্বরত কমান্ডার তাঁর অধীনস্থ একজনকে আমাদেরকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। তারপর আবারও হাঁটা শুরু। দুর্গম প্রস্তরময় ছড়া পথে হাঁটা, তারপর জঙ্গলময় পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌছে গেলাম। অসীম ধৈর্য, অটুট মনোবল আর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের মানসিক দৃঢ়তার কারণে কোন সময়েই ক্লান্তিকে ক্লান্তি বলে মনে হয়নি। কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হয়নি। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌছার পর সেখানকার কর্মীবন্ধুদের সাথে করমর্দন শেষে বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত ব্যারাকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো।

ব্যারাকগুলো বাঁশের পাতায় নির্মিত চালা। ঘরের দৈর্ঘ্য ৩০ হাতের মতো, প্রস্থ ৫ হাত। তিন দিকে বাঁশের বেড়া একদিকে খোলা। সম্পূর্ণ বাঁশের খুটি দিয়ে ঘরগুলো তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের পৃষ্ঠ দেশ হওয়ায় কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সমান করা হয়েছে। তাতে নরম পলিটিন বিছানো হয়েছে। ঐ পলিটিনের উপর নিজস্ব রেকসিন বিছিয়ে নিলাম। তারপর নিজস্ব বেডসীট বিছিয়ে রুখসেকে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। সেখানে ইতিমধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ তামাক সাজিয়ে নিয়ে আসে জনৈক কর্মী। সামান্য পানি পান করে, তামাক টানতে শুরু করি। তারপর স্নান করার প্রস্তুতি। আমাদের জানিয়ে দেয়া হলো স্নান করতে গেলে যার যার ব্যবহারের পানি আনার জন্য। তজ্জন্য ৫/৬ হাত লম্বা বড় বাঁশের চোঁঙা কর্তন করে রাখা হয়েছে। তদনুসারে যার যার বাঁশের চোঙা হাতে নিয়ে আমরা স্নান করতে চললাম।

পাহাড়ের চূড়ায় ব্যারাক হওয়ায় স্নান করতে গেলে অনেক নিচে নামতে হয়। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ এলাকা হওয়াই সূর্যের আলো সীমিত। বেলা থাকতে স্নান ছাড়তে হয়। কোদাল দিয়ে

"প্রকৃত পক্ষে এই সম্মেলনে যোগদান করার পর থেকে আমার রাজনৈতিক জীবনে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে যায়। তাঁর মহাসম্মেলনের ভাষণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দের নানা উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বাস্তবসম্মত যুক্তির মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। তা সত্যিই গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছে। আরও জেনেছি যে, দলীয় সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ঐ ব্যারাকেই তিনি ধারাবাহিকভাবে এক নাগাড়ে চার বছর অতিবাহিত করেছেন। পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। বইপত্র পড়েছেন আর নিয়মিত বিভিন্ন সেক্টর, জোন ও অঞ্চলের মাসিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত দলীয় অফিসের কাজ পরিচালনা করেছেন এবং পার্টিকে নেতৃত্বে দিয়েছেন।"

মাটি কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নামছি আর নামছি। কিছু দূর না যেতেই একজন গৌরবর্ণের সদস্য পানি ভর্তি বাঁশ পিটে করে স্নান করে ফিরছেন। কাছে আসতেই নমস্কার জানিয়ে সম্ভাষণ করলেন। আমরা প্রত্যেকে নমস্কার জানালাম। একেবারেই কাছে আসতেই দেখলাম তিনি আর কেউ নন স্বয়ং আমাদের পার্টির সভাপতি, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আমরা তাঁকে রাস্তা দিলাম, তিনি উঠে গেলেন আর আমরা স্নান করতে নীচে নেমে গেলাম। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে তবেই স্নান করার ঝর্ণাতে পৌছলাম। স্নান করে যার যার বাঁশ পানি ভর্তি করে পিঠে বহন করে উঠে গেলাম। নিজস্ব ব্যারাকের চালায় বাঁশ ঠেকিয়ে রাখলাম। এরপর নিজ বিছানায় হেলান দিয়ে বসে পরলাম।

কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন আমাদের এই মহান নেতা। সকলের সাথে করমর্দন করেন আর অত্যন্ত বিনয়ী ও অমায়িক ভাষায় আমাদের যাবতীয় কুশলাদি জেনে নিয়ে নিজ ব্যারাকে ফিরে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পর দুপুরের খাবারের সিগন্যাল আসলো। তারপরই ভোজন শালায় রওয়ানা দিলাম। তাতেও অনেক নিচে কয়েক শ হাত সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। ছড়ার পাড়ের চেয়ে কিছু উপরে সেখানে লম্বা বাঁশের গিটগুলো কর্তন করে বাঁশ ছিদ্র করা হয়েছে। যাকে চাকমা ভাষায় 'তাগলক' বলে, শহরাঞ্চলে প্লাস্টিক পাইপ বা লোহার পাইপ দিয়ে পানি সরবরাহ করা হয়। সেই পদ্ধতিতে ঝর্ণার উপর ধাপ হতে ঐ পদ্ধতিতে পাকঘরে পানি আনা হয়েছে। পাহাড়ে ঢাল কোদাল দিয়ে কেটে মাটি সমান করা হয়েছে। আর অন্যদিকে মাচাং ঘর তোলা হয়েছে যাকে চাকমারা "ইজোর" বলে। সমান করা মাটির এক পার্শ্বে চুলা, তাতে ভাত ও তরকারি রান্না করা হয়। অপর পার্শ্বে ডাইনিং টেবিল অর্থাৎ গাছের খুঁটি দিয়ে উপরে লম্বা বাঁশ বিছিয়ে হাই-বেঞ্চ ও লো-বেঞ্চ তৈরী করা হয়েছে দুই সারিতে। এক সারিতে ২৫/৩০ জন বসে ভাত খাওয়া যায়। দস্তার বাসনে ভাত খাওয়া। খাওয়া শেষ হলে স্ব স্ব বাসন পরিষ্কার করে ধুয়ে নির্ধারিত স্থানে রাখতে হয়। তারপর খাবার পানির কন্টেনার নিয়ে ব্যারাকে ফিরে আসলাম। অর্থাৎ বলতে গেলে স্নান করলেও পাহাড় একবার উঠানামা করতে হবে। ভাত খেতে গেলেও একইভাবে পাহাড়টা একবার উঠানামা করতে হবে। এটাই তখনকার বাস্তবতা।

ব্যারাকে ফেরার পর বিশ্রাম নেয়ার পালা। তাতে তামাক সেবনের পর বিশ্রামে বই আর পত্রিকা পড়া। কারণ এই গেরিলা জীবন হচ্ছে এমন এক জীবন যাতে একদিকে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা পালন করতে হয়। লোকালয় হতে অনেক দূরে জঙ্গলের গভীরে বসবাসের অভ্যাস করে, দিবা-রাত্রি শৃঙ্খলা পালন আর সমস্ত অস্বাভাবিক বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। এভাবে প্রতিদিন সকালে ৯ টা হতে ১১.৩০ টার মধ্যে দুপুরের খাবার দেয়া হয়। আর বিকালে ৪ টা হতে ৫ টার মধ্যে রাতের খাবার দেয়া হয়। সন্ধ্যার পূর্বে ব্যারাকের ডিউটি কমান্ডার সেন্ট্রি ডিউটি বন্টন করেন। দিবা-রাত্রি সেন্ট্রি ডিউটি থাকে। অবশ্য তা হচ্ছে জেনারেল সেন্ট্রি ডিউটির ব্যাপার। আর অফিসার ব্যারাকেও ব্যারাকের কমান্ডার রাত্রিকালীন ডিউটি নির্ধারণ করেন। সে অনুসারে নিয়মিত ডিউটি চলতে থাকে এইভাবে দৈনন্দিন ব্যারাকে গেরিলা জীবন চলতে লাগলো।

তৎসময়ে পার্টির নেতৃত্ব সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে ৫টি সেক্টর, ২০টি জোন, ৪৫টি সাংগঠনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আওতাধীন সকল সেক্টর, জোন এবং অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলন তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাতে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলসহ সমগ্র দেশের এবং আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন, বিভিন্ন অঞ্চলের গণসংগঠন ও কর্মী সংগঠনের বিভিন্ন দিক আলাপ-আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দের তরফ থেকে দলীয় নীতি ও আদর্শগত অবস্থান নিয়ে নানামুখী পর্যালোচনা ও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। সকল প্রশ্ন ও মতামতের উপর পার্টির সভাপতি এম এন লারমা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং যথাযথ যুক্তির ভিত্তিতে বক্তব্য রাখেন। বলতে গেলে সকল প্রতিনিধিবৃন্দ যথাযথভাবে নিজেদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন পার্টির সভাপতি বক্তব্যের মধ্যে। কেন রণনীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কৌশলগতভাবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সমর্থন এবং কেন গণসংগঠন ও কর্মী সংগঠনের ভিত্তির উপর নির্ভর করে অস্তিত্ব রক্ষার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে তার যথার্থ যুক্তি তুলে ধরেন। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবিত প্যানেল উত্থাপিত হয়। তা সর্বসম্মতভাবে কণ্ঠভোটে পাশ হয়ে যায়। সম্মেলনে এম এন লারমাকে সভাপতি এবং ভবতোষ দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলন শেষ হলো। আমি কাচলং এলাকার কর্মীবন্ধুদের সাথে রওয়ানা হবো। এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। তাই নব গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের সাথে সাক্ষাৎ করে পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করি। পরদিনই কাচলং এলাকার কর্মীবন্ধুদের সথে রওয়ানা হই। দীঘিনালার বানছড়া হয়ে আটার কাপ্যা মোন (উচু পাহাড়) অতিক্রম করে করেঙ্গাতলীতে কর্মীর বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। পরদিন রূপকারী-বাঘাইছড়ি হয়ে সিজকে পৌছি। সিজক পর্যন্ত কাচলং এর কর্মীবন্ধুরা সঙ্গে ছিলেন। এর পর আমি একা সেখানে জনৈক কর্মীর বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। এর পরদিন সকাল ৯টায় সিজক হতে দূরছড়ি বাজার হয়ে খেদারমারায় যাবো এমন উদ্দেশ্য নিয়ে গণলাইনের কর্মী মাধ্যমে রওয়ানা হই। তখন ছিল বোরো মৌসুমের ফসল কাটার মাস। সিজক খালের পাড় দিয়ে কেবল ধানের ক্ষেতের বিশাল মাঠ দেখা যায়। দূরছড়ি বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ বিস্তৃত ফসলের মাঠ। কৃষকেরা পাকা ধান কেটে সিজক ও কাচলং পাড়ের খামার বাড়ি তৈরী করে খামার বাড়ির সামনে কাটা ধানের তারা স্তুপ আকারে রেখেছেন। আর গরু দিয়ে ধান মাড়াই করছেন।

সিজক মুখে নৌকা যোগে কাচলং পাড়ি দিয়ে দূরছড়ি বাজারের উত্তর দিক দিয়ে একটু ঘোরালো করে একেবারে খেদারমারা পৌছলাম। সেখানে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতির বাড়িতে উঠলাম। সেখান হতে সিজক থেকে আসা গণলাইনের লোকদের বিদায় দিলাম। তারপর গ্রামের সভাপতির সাথে বিস্তারিত আলাপ করে পরিস্থিতির খবর জেনে নিলাম। মোটামুটি তখন সার্বিক অবস্থা ভালো ছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়াসহ রাত্রি যাপন হলো।

এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি আমার জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা করলেন। তারপর দুইজন গণলাইন-এর লোক আমার সাথে দিলেন। তারা আমাকে সেখান হতে মাইনি অতিক্রম করে ডাইনের আটরকছড়ার গণলাইনের পোস্টে দিয়ে বিদায় দিয়ে আসলেন। তৎপর সেখান হতে গণলাইন এর মাধ্যমে করল্যাছড়ি হয়ে বামের আটারকছড়াতে পৌছলাম। অবশ্য পরপর গণ লাইনের লোক রদবদল করতে হয়েছে প্রত্যেক গ্রামে। আটারকছড়ার অমিয়সেন বাবুর বাড়িতে উঠলাম। সেদিনটা বিশ্রাম স্বরূপ সেখানে রাত্রি যাপন করি।

তারপর দিনই আমি লংগদু হয়ে গণলাইনের লোক মাধ্যম নানিয়ারচরের এগারাল্যা ছড়া, সাবেক্ষ্যং হয়ে আমার গ্রামের বাড়ি খামার পাড়ায় পৌছি। এই গেলো আমার প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগদান করে ফেরা পর্যন্ত দীর্ঘ পদব্রজে ভ্রমণ আর দায়িত্ব পালনের বিষয়।

প্রকৃত পক্ষে এই সম্মেলনে যোগদান করার পর থেকে আমার রাজনৈতিক জীবনে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে যায়। তার মহাসম্মেলনের ভাষণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দের নানা উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বাস্তবসম্মত যুক্তির মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। তা সত্যিই গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছে। আরও জেনেছি যে, দলীয় সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ঐ ব্যারাকেই তিনি ধারাবাহিকভাবে এক নাগারে চার বছর অতিবাহিত করেছেন। পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। বইপত্র পড়েছেন আর নিয়মিত বিভিন্ন সেক্টর, জোন ও অঞ্চলের মাসিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত দলীয় অফিসের কাজ পরিচালনা করেছেন এবং পার্টিকে নেতৃত্বে দিয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চল, জোন, সেক্টরে সময়োপযোগী পরামর্শ-নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের দলীয় কাজে নিয়মিত হওয়ার জন্য কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দলীয় স্বার্থকে তথা জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কী করে কাজ করতে হয় তা হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। শুধু তাই নয় সম্মেলনের সর্বশেষ প্রদত্ত ভাষণে তিনি আন্দোলনের রণনীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কৌশলগতভাবে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক সাহায্য সমর্থন লাভের জন্য প্রয়াস চালানোর দর্শন যে নির্ধারণ করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত।

তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী ১১টি জাতিসত্তার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মূলমন্ত্র যে একমাত্র জুম্ম জাতীয়তাবাদ হতে পারে তা তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এই পার্বত্য অঞ্চলে যেহেতু বহু জাতিসত্তার বসবাস সেহেতু কোন এক বিশেষ জাতিসত্তার নামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হতে পারে না এবং জাতিগঠনের প্রক্রিয়াও হতে পারে না। যেহেতু প্রত্যেক জাতিসত্তার ঐতিহাসিকভাবে অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা জুম চাষ, সেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থার অভিন্নতার কারণে, প্রত্যেক জাতিসত্তায় সহজাত সারল্য বিদ্যমান। সেই সারল্যতাই অভিন্ন মানসিক গড়ন গড়ে উঠেছে। অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা জুম চাষ হওয়ার কারণে প্রত্যেক জাতিসত্তার আলাদা ভাষা হলেও ঐ জুমকে কেন্দ্র করেই প্রত্যেক জাতিসত্তার নাচ, গান, আচার, আচরণে একটা অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই জুম্ম জনগণের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে জুম্ম জাতীয়তাবাদ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজে চাকমা হলেও তিনি চাকমা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অথবা উগ্রজাতীয়তাবাদ হতে মুক্ত হয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলেছেন।

পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক জাতিসত্তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসনের শিকার এবং নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। সকল জুম্ম জাতিসত্তার অস্তিত্ব আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। তাই প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে গেলে, সংঘবদ্ধভাবে জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে স্ব স্ব জাতিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের মূলমন্ত্র হলো জুম্ম জাতীয়তাবাদ। তাই এম এন লারমার জুম্ম জাতীয়তাবাদের দর্শন সকল জাতিসত্তার ঐক্যের দর্শন তথা সকল জাতিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার দর্শন। তাই এম এন লারমার রাজনৈতিক দর্শন শুধু নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল দর্শন নয়, তার ব্যক্তিগত দৈনদিন জীবনও ছিল আত্মনির্ভরশীল। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। অন্যকে করতে দিতেন না। নিজের রুখসেক নিজে বহন করতেন, নিজের কাপড় নিজে কাঁচতেন, নিজের খাওয়া ও ব্যবহারের পানি নিজে বহন করতেন। এই আত্মনির্ভরশীল দর্শনে বিশ্বাসী এম এন লারমা সকলকে সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজ আমাদের মাঝে নেই। ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও দালালদের কুচক্রান্তে পা দিয়ে নিজেদের দুর্নীতি ব্যভিচারকে ঢামাচাপা দেয়ার জন্য ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এক বিশ্বাস ঘাতকতামূলক আক্রমণে এই মহান নেতার জীবনকে কেড়ে নিয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত নীতি-আদর্শ ও তাঁর দর্শনকে কেড়ে নিতে পারেনি। বরং এম এন লারমার রাজনৈতিক দর্শন, সংগ্রামের দিক-নিদের্শনা চির অম্লান ও অমর হয়ে থাকবে। তাঁর এই দর্শনের ভিত্তিতে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক সর্বহারা তথা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। আর এই দর্শন জুম্ম জনগণের ঐক্য ও সংহতির দর্শন তথা জুম্ম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দর্শন এবং যুগ যুগ ধরে শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত জুম্ম জনগণের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্তির দর্শন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : নবজাগরণের বাণী

শরৎ জ্যোতি চাকমা

যে জাতি সংগ্রাম করতে জানে না পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই

প্রতিভাধর মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে জুম্ম অঞ্চলের মানুষ নিজেদের মননে ধারণ করেছিল। ফলাফল, পাহাড়ি ছাত্র ও যুব সমাজে তাঁর বঞ্চনা বিরোধী প্রতিটি চিন্তা রেখাপাত করে, জুম্ম জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পরিণতি মহান বিপ্লবী পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জন্ম। লেনিন বলেছেন, প্রত্যেকটি দেশেরই স্বকীয় পরিস্থিতি থাকে এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপে প্রগতিশীলদের তা হিসেবে রাখতে হবে। পাহাড়ে সংগ্রাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তাধারায় তাঁর নিজ জাতিসমূহের উপর শোষকের চাপিয়ে দেয়া দাসত্ব ও নিপীড়ন অন্যতম একটি দিক বটে, তথাপিও সুসঙ্গত আন্তর্জাতিকতা তার প্রতিটি কথা এবং কাজে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশের মধ্যেও আরো অধিকতর পশ্চাৎপদ আদিবাসী জুম্ম জাতির অস্তিত্ব নিয়ে যখন চরম সংকট দেখা দেয় তখনই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এমন উক্তি বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জাতিকে সংগ্রামী করে তোলে।

অন্ধকার থেকে আলোর দিশা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা

নেতার সংগ্রামের গাণিতিক সমীকরণ প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক বন্ধুরতার মুখোমুখি হয়েছে দলটি। ঘুণেধরা সামন্ত সমাজের বর্বরতা, রাষ্ট্রীয় শাসক-শোষক শ্রেণির বিরূপতা, উপদলীয় চক্রান্তের অনেক আঘাত পার্টিকে সইতে হয়েছে বটে নেতৃত্বের বিচক্ষণতাই প্রতিবারই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জনসংহতি সমিতির সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭২-১৯৮৩ সালকে জুম্ম জনগণের নব জাগরণের অধ্যায় যেমনি বলতে হবে তেমনি বিষাদের এবং গ্লানির কিছু মুহূর্তও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। নবজাগরণ এই অর্থে- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ে বিপ্লব সাধিত হবে। একটি বিপ্লবী পার্টির জন্ম হয়েছে। মোঘল বৃটিশ পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলা শোষকের দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার শপথে সমস্ত শিক্ষক, কৃষক শ্রমিক জুম জনতা নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। জনসংহতি সমিতির পতাকায় অবারিত বন-বনানির প্রতিচ্ছবি। এই সময় জুম্ম জনগণের স্বপ্ন দেখার। এই সময় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার। এই সময় পাহাড়ে রক্ত চঞ্চল ছাত্র-যুব সমাজের জাতির কান্ডারী হওয়ার। এই সময় অশিতির পর বেঁচে থাকা জুমবির জীবন বন্দনার। এই সময় চেঙেই, মেয়োনি নদীর তীরে লাখো জনতার পথ চলা। কাজলং বরগাং উপত্যাকায় নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করা মানুষের রুখে দাঁড়ানো। এই সময় শঙ্খ মাতামহুরীর নতুন দিগন্ত। এই সময় কাপ্তাই বাঁধে সৃষ্ট বরপরং বিরোধী রাজপথ কাঁপানো হাজার জনতার শ্লোগান। এই সময় শঙ্খ মাতামহুড়ির নতুন দিগন্ত। এই সময় কাপ্তাই বাঁধে সৃষ্ট বরপরং বিরোধী রাজপথ কাঁপানো হাজার জনতার শ্লোগান। এই সময় জুম্ম জনগণের নব জাগরণ।

বিষাদ আর গ্লাণিময় এই অর্থে- পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কুচক্রীদের ভন্ডামি। পার্বত্য সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির মত অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগান পার্টি সদস্যদের শ্রেণি চরিত্রের পরিষ্কার দিক উন্মোচণ করে। পার্টির সাহিত্য পাঠে জানা যায়- ১৯৮২ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর পার্টির জাতীয় সম্মেলনকে ঘিরে বিভেদপন্থীদের ভন্ডামি অনেক সক্রিয় ছিল। এই ভন্ড উপদলীয় চক্রান্ত সৃষ্টিকারীরা পার্টির নীতি ও কৌশল এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রচেষ্টা চালায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শি চিন্তাধারা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কোন প্রকার অঘটন ছাড়াই জাতীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। জাতীয় সম্মেলনরে ফলাফল মেনে নিলেও বিভেদপন্থীদের অপতৎপরতা থেমে থাকেনি। নেতার দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহস ও মহানুভবতায় গৃহযুদ্ধ অবসানের পথ রচিত হলেও বরাবরই দ্রুত নিষ্পত্তিবাদীরা তাদের ষড়যন্ত্রের অপকৌশল বহাল রাখে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নেতার মহান ক্ষমা ঘোষণাসহ সকল প্রকার চেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জাতীয় কুলাঙ্গার, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ৮জন সহযোদ্ধাসহ মহান নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দেখার সুভাগ্য আমার হয়নি। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর পরবর্তী বছরগুলোতে গ্রামে আমার দাদা-দিদিরা, মা-বাবারা এবং পুরো গ্রামের মানুষ ১০ নভেম্বর আসলে গাছের সবুজ পাতা ছিঁড়ে না, পায়ে সেন্ডেল পড়ে না। কেন এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমার এক দিদি বলেছিলেন, এই দিনে লারমাকে মেরা ফেলা হয়েছে। আর দিদির বলা সেই লারমাই আমার জাতীয় পরিচয় যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের পথ প্রদর্শক। আমাদের প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সেইদিন দিদি আমাকে নেতার হত্যাকারী ঘাতকদের নাম বলেনি। হয়ত তার জানা ছিল না। পার্টির নতুন নেতৃত্ব এবং গণমানুষের কাছে এম এন লারমার হত্যাকারী ঘাতকদের নাম জানা এবং তাদের কৃতকর্মের ফল গোটা জাতিকে বহন করতে হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পারা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। এম এন লারমা হত্যাকারী ঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের প্রেতাত্মা এখনো পার্টি এবং জুম্ম জাতির ভাগ্যে ছোবল মারার চেষ্টা করে। যার প্রমাণ ২০০৭ সালের দেশে জরুরী শাসন। পার্টির বর্তমান নেতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে ভয়ংকর অবস্থা থেকে পার্টি এবং জাতিকে বাঁচানো গেছে বটে তথাপিও অপশক্তি সুযোগের সদব্যবহারের প্রচেষ্টায় তৎপর রয়েছে তা পার্টি সভ্যদের মনে রাখা জরুরী। যে মানুষটি নিজের

সমস্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে পশ্চাৎপদ এই জাতিসমূহের ভাগ্য নির্মাণে নিবেদিত প্রাণ তাঁর উপর এমন বর্বর আঘাত সমস্ত মেহনতি মানুষের বুকে বুলেট নিক্ষেপের শামিল। ১৯৮৩ সালের ৯ নভেম্বর রাতে নেতার উপর ঘাতকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন গণমানুষের প্রিয় নেতা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ঘাতকদের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো বলেছিলেন সে গুলো উদ্ধৃত করে আমার কিছু লেখার চেষ্টা।

কি, তোমাদের ক্ষমা করে আমরা অন্যায় করেছি?

১৯৮৩ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের একটি দিন। রাত পেরোলে আলোকিত হতে পারতো হেমন্তের আরো একটি সকাল। সূর্য দেব প্রতিদিনের মত তার আলোক রশ্মি ধরণীর প্রতি প্রান্তে ছড়িয়ে বিপ্লবীদের আরো নব ভাবনার সুযোগ করে দিতে পারতো। বঞ্চিত পাহাড় স্বপ্নের জয়ধ্বনি করতো। সেইদিন ভোর রাতে মুহুর্মুহু বুলেটের আওয়াজ জাতির স্বপ্ন ভাঙারই অশনি সংকেত। কেউ ভাবতেই পারেনি রজনী শেষ না হতেই জুম্ম জাতির অগ্রপথিকের উপর ঘাতকের বুলেট বৃষ্টি বর্ষিত হবে। প্রিয় নেতার সর্বাঙ্গ শরীরে ঘাতকের বুলেট। মারাত্মকভাবে আহত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবীর মনোবল সুদৃঢ়। তার সাথে থাকা কর্পোরেল সৌমিত্র আহত হয়ে দু'দিন জীবিত ছিলেন। মারতে আসা ঘাতকদেরকে মহান নেতা যা বলেছিলেন, বীর শহীদ সৌমিত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে তার সহযোদ্ধাদের শুনিয়ে চির বিদায় নিয়েছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন, "কি, তোমাদের ক্ষমা করে আমরা অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক, তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনো ভুলে যেও না আর জাতির এই আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না (রক্তাক্ত ১০ নভেম্বর, পেলে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম)।

মহান নেতার এমন উক্তি শুনে মারতে আসা ঘাতকের মনে আঘাত হানে এবং মাথা নিচু করে চলে যায়। কিন্তু আরেক ঘাতক এসে নেতাকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করে ফায়ার করে চলে যায়। নেতা আর নেই। বিচ্যুতিবাদী বেঈমানরা তাঁকে আর বাঁচতে দিল না। নেতা তার ৮ জন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ইহলীলা সংবরণ করলেন। কী নির্মম এই ধরিত্রী! যিনি নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জয়গান করেন, ভেদাভেদহীন সমাজের জন্য আপোসহীন সংগ্রামী, জীবপ্রেমে দয়ার সাগর, মেহনতি মানুষের অতীব আপন ব্যক্তিত্ব তাকেই কিনা সেই সংকীর্ণ স্বার্থে তাঁরই হাতে গড়া বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র শেষ করে দিলো। ভাবতেই কষ্ট হয়। সেইদিন চারিচক্রপাল দেবতারা বিভেদপন্থীদের ধিক্কার জানিয়েছে সন্দেহ নেই। হেমন্তের পাহাড়ময় পত্রপল্লবে মর্তে ঝরা কুয়াশার শিশির বিন্দুগুলো নেতার মৃত্যুর গ্লানি সইতে না পেরে বিদ্রোহী হয়ে তোমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছে। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ সেদিন এই বিচ্যুতিবাদীদের ধিক্কার জানিয়েছে। নিপীড়িত মানুষ কেঁদেছে। নেতার সহযোদ্ধারা কেঁদেছে। জুম্ম জাতি কেঁদেছে। শোকাহত হয়েছে সন্ত লারমা। তবু তাকে লড়তে হবে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্নকে পাহাড়ের প্রতিকোণায় বাস্তবায়ন করার জন্যই তাঁকে লড়তে হবে। সন্ত লারমার নেতৃত্বে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এখনো আমরা ঐক্যবদ্ধ। নেতার ক্ষমাগুণ অসীম। দলের ভিতর লুকিয়ে থাকা ঘাতকদের ক্ষমা করে নেতা অন্যায় কিছু করেননি বরঞ্চ নেতৃত্বের বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু যারা এই বিচক্ষণতাকে এবং উদারতাকে দুর্বলতা মনে করে সেইসব শ্রেণি শত্রুদের ক্ষমা করা বিশ্লেষণের দাবী রাখে বলে আমি মনে করি। নেতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জুম্ম জনগনের ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম থাকা চাই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বীর শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না।

আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে?

নেতার সহযোদ্ধাদের বয়ান থেকে জানা যায়, সেইদিন প্রকৃতির বিকট গর্জন ভয়াবহতার রূপ নেবে আভাস পাওয়ায় বিশেষ কাজ শেষ করে তাড়াতে ব্যারাকে ফিরেছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ঝরো হাওয়া আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি মনে বিষন্নতা এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই। তারপরেও সকলেই যার যার কাজে ব্যস্ত। রজনী এসে হাজির হয়। জাতি মুক্তির সংগ্রামের কত পরিকল্পনার ছক আঁকেন প্রিয় নেতা। শীতল হাওয়া আর বৃষ্টিতে ভিজে নেতার শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হয়। সেবা শুশ্রুষা সত্ত্বেও রোগ সরে না। সহযোদ্ধারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। মধ্য রজনি পেরিয়েছে। অসুস্থতার যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। নেতা যাদের ক্ষমা করেছিলেন তাদের প্রতিহিংসার উন্মত্ততা হত্যা করেছে এই জাতির বেঁচে থাকার স্বপ্ন। ভূমি এবং জন্মভূমির অধিকার বঞ্চিত জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষায় যে ব্যক্তি শ্রেণিচ্যুত হয়ে বিপ্লবী হয়েছেন, ধারণ করেছেন মহান আদর্শ মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম আর তাঁকে কিনা এই জাতিরই কিছু কুলাঙ্গার নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ধিক! গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র। তোমাদের বেঈমানীতে আজ দিশাহীন এই জাতি। যে মানুষ দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত নির্যাতিত জাতির সেবাই নিজের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও দান করেছেন সেই জাতি তাদের জাতীয় জাগরণের মহানায়ককে একফোঁটা ঔষধ খাওয়ার সুযোগ পেলনা। ঘাতকেরা প্রিয় নেতাকে হত্যা করেছে। অসুস্থ ভাইকে দেখতে আসা শুভেন্দু প্রবাস লারমা তুফান এবং সহযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে। ক্ষমতালোভী চক্র পার্টির মধ্যে উপদলীয় চক্রান্ত সৃষ্টি করে পার্টির আন্দোলন সংগ্রামকে চিরতরে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

অতীব আপন ভেবে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হয়ত গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের সামনে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন জোরদার করো। শোষকের চাপিয়ে দেওয়া দাসত্বকে ঘৃণা করো। প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলো। পাহাড়কে যারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় তাদের উপর আঘাত করো। জোরালোভাবে আঘাত করো। এই পাহাড় আমার-তোমার তথাপিও আমাদের এবং আমাদের সকলের। এই পাহাড় আমাদের পূর্ব পুরুষদের। এই পাহাড় ছেড়ে আমরা কোথাও যেতে পারি না। জুম্ম জাতি এক সাথে বাঁচবো। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো। শোষকের

বিরুদ্ধে লড়বো। নেতার এমন বিজ্ঞান ভিত্তিক গুণমুগ্ধ বৈপ্লবিক আহ্বানে যখন সমগ্র জুম্ম জাতি ঐক্যের পথে তখন সংকীর্ণবাদী বিভেদপন্থীদের ক্ষমতালোভী লালসাগুলো জ্বলজ্বলে ছিল তা পরিষ্কার ধারনা করা যায়। গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশদের বৈষয়িকতা, ক্ষমতা লোভ, আপোষমুখীনতা তাদের শ্রেণি চরিত্রেরই বহি:প্রকাশ। তারা এম এন লারমার প্রদর্শিত দর্শনকে মনে ধারণ করতে পারেনি। নেতাকে আপন করে নিতে পারেনি। নেতার আসনে নিজের অবস্থানকে কল্পনা করেছিল বিধায় এমন ন্যাক্কারজনক লজ্জাকর কান্ড ঘটাতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। "আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে ?" একজন শিশুও বুঝতে পারতো নেতাকে কিংবা তাঁর সহযোদ্ধাদের হত্যা করে জুম্ম জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। বরং জাতির স্বপ্নকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। ঘাতকেরা বুঝেনি অথবা না বোঝার ভান করে জাতির দুর্দিনের সূচনা করেছেন। নেতার এই অমর বাণী কয়েকজন ঘাতকের হৃদয়েও বিদ্ধ করেছিল। যার কারণে প্রথমে যারা তাঁকে মারতে এসেছিল নীরবে চলে যায়। কিন্তু গুটিকয়েক পাষান্ড ঘাতকের মনে নেতার এই কিংবদন্তি উক্তি অভিশাপের মত মনে হয়েছিল বিধায় বুলেট গর্জনে তারা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নকে চিরতরে শেষ করে ফেলেছে।

তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে কখনো ভুলে যেওনা আর জাতির এই আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিওনা

জনসংহতি সমিতির মানবতা আর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অগাধ ক্ষমা করার গুণে পার্টি অগ্রসরমান। নেতার নেতৃত্বের বিচক্ষণতায় পার্বত্য ভূ-খন্ডের প্রতিটি বঞ্চনার কথা দেশে বিদেশে প্রচার হতে থাকে। ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ জুম্ম জনগণের পথ চলায় গতিশীলতা আসে। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে নেতার নিজ জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় এবং সমগ্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণির অধিকারের রাজনৈতিক বয়ান এই ব-দ্বীপে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। অধিপতি শ্রেণি লারমার এই বয়ানে রুচিহীন হলেও বঞ্চিত ও প্রগতিশীল অংশ মেনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আমাদের গর্বে বুক ভরে যায়। তিনি দেশের মাটি এবং মানুষকে ভালবাসেন। সর্বজীবে ছিল প্রেম। তিনি তার জুম্ম জাতির মুক্তির প্রশ্নে নিজ জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাহীন। বহুত্ববাদী এই নেতা যিনি কঠোর শ্রমে এবং মেধায় জাতি মুক্তির সমীকরণ তৈরি করেছিলেন তা অংকুরেই বিনাশ করে দিয়েছে গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশ চক্র।

পার্বত্য ভূ-খন্ডে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতি অধিপতি শ্রেণির উদাসীনতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে গভীর ভাবনায় ফেলে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর জন্ম নেওয়া বাংলায় সবাই বাঙালি অধিপতির জাত্যাভিমানী বচনকে মানতে পারেননি এম এন লারমা। জাতীয় সংসদে উচ্চারিত হয় নেতার ঐতিহাসিক প্রতিবাদের ধ্বনি "আমি বাঙালি নই"। জুম্ম জাতির ভাগ্যে নেমে আসে চরম দুর্দশা। দুর্দশাগ্রস্ত জুম্ম জাতিকে আলোর পথে এগিয়ে নিতে এম এন লারমা দাঁড় করাতে থাকেন একের পর এক লড়াই সংগ্রামের গাণিতিক সমীকরণ। অধিকারের জন্য শোষকের উপর আঘাত করো বজ্রধ্বনির তালে যখন সংগ্রামের গাণিতিক সমীকরণ সমাধানের পথে তখনই জাতীয় বেঈমান কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের সশস্ত্র উপস্থিতি। নেতার উপর কাপুরুষিত হামলা। মহান নেতা যে ঘাতক তাঁকে মারতে এসেছিল তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে কখনো ভুলে যেও না আর জাতির এই আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না"। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করে ঘাতকেরা সাময়িক উল্লাসিত হয়েছিল বটে কিন্তু সেখানেই তারা চরম পরাজয় বরণ করেছে। তারা ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। পরাজয়ের গ্লাণি সইতে হচ্ছে। শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্নে যে ব্যক্তি সংগ্রাম শুরু করেছেন তাঁকে হত্যা করে সুবিধাবাদী শ্রেণিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অভ্যন্তরীণ শ্রেণি বিভাজনের কারণে শোষক শ্রেণিগুলো পাহাড়ের জাতিসমূহের উপর তাদের শোষণের যন্ত্র মজবুত করতে সক্ষম হয়।

দুনিয়াতে যারা একা বাঁচতে চায় ইতিহাস থেকে তারা হারিয়ে যায়, সবাইকে নিয়ে যারা বাঁচতে চায় তারাই ইতিহাসে অমর হয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তীয় চিন্তাধারার প্রকটতা এবং উপনিবেশিক শাসন-শোষণের কারণে জাতিসমূহের অস্তিত্ব যখন চরম বিপর্যয়ে ধাবিত তখনই লারমা পরিবারের প্রগতিশীল চিন্তা ও সংগ্রাম পিছিয়ে পড়া জাতিগুলোকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। লারমা সংগ্রামী হওয়ার পেছনে পারিবারিক শিক্ষাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর শিক্ষক পিতা ছিলেন একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং শিক্ষা আন্দোলনে লারমা পরিবার ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। নানা জাতি ও শ্রেণি-পেশার মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রামী জীবনের এক বিরাট সফলতা। মার্কস বলেছেন, শ্রেণির অস্তিত্ব কেবলমাত্র উৎপাদন বিকাশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত। আর শ্রেণিসংগ্রামের অনিবার্য গতি হবে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব এবং এই একনায়কত্বই সমস্ত শ্রেণি বিলুপ্ত করবে এবং শ্রেণিবিহীন সমাজের উত্তরণ ঘটাবে। আবার এশীয় সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার গতিহীনতায় শ্রেণি এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন মার্কস। সে ক্ষেত্রে তাঁর মত হলো শ্রেণি সংগ্রামই ইতিহাসের গতি সঞ্চার করে।

সকল সমাজেই ক্ষেত্র বিশেষে শ্রেণি সংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। পার্বত্য সমাজ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী। শ্রেণিযুক্ত সমাজ। আর এই শ্রেণি সংগ্রামই পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ে আদিবাসী মানুষের লালিত স্বপ্নগুলো আজকে নানাভাবে আঘাত করে চলেছে। শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সৃষ্ট সংগ্রাম শ্রেণিযুক্ত সমাজের শিরা

২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পাভেল পার্থ*

তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, অবিসংবাদিত নেতা, কঠোর সংগ্রামী ও বিপ্লবী চিন্তাবিদ,
অসীম ধৈর্যশীল, সাহসী, আত্মত্যাগী, সৎ ও দূরদর্শী, সংগঠক ও সমাজসেবক,
দার্শনিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী
অথচ তিনি ছিলেন নিতান্ত সাদাসিদে, নিরহংকারী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী,
ভদ্র, অমায়িক ও ক্ষমাশীল

(সজীব চাকমার দীর্ঘ কবিতা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ, রাঙ্গামাটি)[১]

আজকের আলাপের 'তিনি' হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাসূত্র। স্বাধীন বাংলাদেশে যিনি প্রথম 'জাতীয়তার রাজনৈতিক' তর্ক হাজির করেছিলেন। 'পরিচয় এক সতত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অভিধা' এ সূত্রকে কেন্দ্রে রেখে আমরা চলতি আলাপটিকে পরিচয় নির্মাণবিনির্মাণের রাজনীতি, অধিপতি রাষ্ট্রের উপস্থাপনের ক্ষমতা ও নিম্নবর্গের পরিচয়-সংগ্রাম হিসেবে পাঠ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচিত আদিবাসী সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে খুব একটা বিশ্লেষণধর্মী দলিল দস্তাবেজ আমাদের হাতের নাগালে নাই। কখনো কখনো তাঁর জন্ম ও মহাপ্রয়াণ দিবসকে ঘিরে কিছু 'বিশেষ প্রকাশনা ও দৈনিকে' কিছু লেখালেখির হদিশ পাওয়া যায়। মঙ্গল কুমার চাকমা, শক্তিপদ ত্রিপুরা, দীপায়ন খীসা, সজীব চাকমা, সোহরাব হাসান, বিলু কবীর, রোবায়েত ফেরদৌস, সঞ্জীব দ্রং, বিপ্লব রহমান ও পাভেল পার্থের কিছু লেখালেখির হদিশ পাওয়া যায়। অধিকাংশ বিবরণে তাঁকে 'মহান' ও 'অনিবার্য' হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও, কেন যে তিনি মহান ও অনিবার্য তার স্পষ্ট কার্যকর সূত্র ও সম্পর্কগুলো জোরালো কায়দায় আলোচিত হয় না। চলতি লেখাটি তারচে' আরো দুর্বল অবয়বের নির্মাণ।

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর থানার বুড়িঘাট মৌজার মাওরুম (বাঙালিরা যে গ্রামের নাম দিয়েছে মহাপুরম) আদামে (চাকমা ভাষায় গ্রামবসতি মানে আদাম) জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই গ্রামজনপদ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কৃত্রিম বাঁধের তলায় ডুবে গেছে। সুভাষিণী দেওয়ান ও চিত্ত কিশোর চাকমার চার সন্তানের ভেতর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৃতীয়। মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। ১৯৬৬ সালেই খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালার দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে

[১] 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা' নামে সজীব চাকমার এ লেখাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক '১০ নভেম্বর'৮৩ স্মরণে শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ১০ নভেম্বর ২০০৩।

যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বিএড পরীক্ষা দেন। ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশের পর চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সনেই ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯৫৭ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনের একজন কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। ১৯৫৮ সনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১৯৬০ সনে পাহাড়ী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বদানের পাশাপাশি ১৯৬১ সনেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন এক বিশাল পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন। চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ী ছাত্রাবাস থেকে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে বিশেষ নিবর্তনমূলক আইনে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনে দায়িত্বপালন করেন এবং এই সনেই পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পার্বত্য অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উত্থাপন করে চার দফা দাবি পেশ করেন[২]। ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে দেশের সকল জাতিদের একত্রে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে গণপরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন। ১৯৭৩ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সরকারের পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি হিসেবে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে লন্ডন সফর করেন। ১৯৭৪ সালে বাকশালে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট থেকে আত্মগোপন করেন। ১৯৭৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম সম্মেলনের মাধ্যমেও পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন।

উইকিপিডিয়া থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরের দিনই তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং গড়ে তুলেন জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী। একইসাথে তিনি গড়ে তুলেন মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী[৩]। তবে অনেকেই মনে করেন ১৯৭৩ সনের ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনী গঠিত হয়[৪]। ১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলনের মাধ্যমেও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ভোররাতে বিভেদপন্থী ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ)-দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)-ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে পার্টির আটজন নেতাসহ নির্মমভাবে নিহত হন। কাপ্তাই বাঁধের ফলে জন্মগ্রাম তলিয়ে গেলে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আশ্রয় নেয় লারমা পরিবার। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নামে পানছড়ি উপজেলার একটি গ্রামের নাম হয় *মঞ্জু আদাম*।

পরিচয় এক রাজনৈতিক তর্ক

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবনভর কি জীবন দিয়ে এক মানবিক সম্পর্ক বিনির্মাণের রাজনীতি করে গেছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেই রাজনৈতিক জীবনকে আমরা কীভাবে এবং কোন বহমান স্মৃতির ভেতর দিয়ে পাঠ করবো? সচরাচর মৃত, নিখোঁজ কি হারিয়ে যাওয়া কোনো মানুষকে আমরা পাঠ করি স্মৃতি আখ্যান থেকে। অধিকাংশ সময় প্রাতিষ্ঠানিক কায়দায় নথিভুক্ত স্মৃতি ও বয়ানগুলোই এক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাস বোঝার জন্য কোনোভাবেই এটি একমাত্র কায়দা নয়। সমাজ ও ব্যক্তিতে বহমান চিন্তা ও চর্চাগুলো থেকেও আমাদের সেটি খোঁজা জরুরি। এক্ষেত্রে মৌখিক বয়ান ও বিরাজিত স্মৃতির টুকরোগুলো খুব কাজে দেয়। কোনো মানুষকে পাঠ করে ইতিহাসের পালক স্পর্শে তা অধিকতর জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। বিখ্যাত মৌখিক ইতিহাসবিদ থম্পসন (২০০০) জানান, *সকল ইতিহাসই সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাসই ইতিহাসের নিগড়। ইতিহাস যত পুরনো, মৌখিক ইতিহাসও তার সমবয়সী। মৌখিক ইতিহাসই ইতিহাসের প্রথম ধরণ। তবে একজন দক্ষ ঐতিহাসিক কি কায়দায় একে বিন্যাস্ত করছেন সেখানেও মৌখিক ইতিহাসের ব্যাপ্তি ও বিশ্বস্ততা নির্ভর করছে*[৫]। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক কোনো অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার কি আলাপচারিতায় অনেকেই বলেন, ১৯৭২ সনে তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয় গোপন সংগঠন 'রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি'। অনেকে উক্ত সংগঠনকে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নিউক্লিয়াস মনে করেন[৬]। লেখক, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান (২০১০) তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন, মার্কসীয় আদর্শ তিনি ধারণ করেছিলেন তাঁর আন্দোলনের জন্য। পরে জিয়াউর রহমান নতুন বাঙালিদের পাহাড়ী অঞ্চলে অভিবাসিত করলে তাঁদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে তাদের লড়াই তীব্রতর হয়ে ওঠে[৭]। হতে পারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কার্ল মার্কসসহ দুনিয়া কাঁপানো তাত্ত্বিকদের শ্রেণি রাজনৈতিক চিন্তাতত্ত্ব দ্বারা

---

[২]এটি তৈরি করা হয়েছে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ এবং ২০০২ সালের স্মরণিকা থেকে। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। পৃ.৫-৬

[৩]অংশটুকু উইকিপিডিয়া থেকে নেয়া হয়েছে, বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন : http://bn.wikipedia.org/wiki/

[৪]মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কিত এন্ট্রিতে উইকিপিডিয়া 'ভেঙ্গে গেলো জনসংহতি সমিতি, নতুন কমিটি' নামের একটি লেখা থেকে এ তথ্য দিয়েছে। লেখাটি উইকি সংগ্রহ করেছে ২৩/০২/২০১১। বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন : http://bn.wikipedia.org/wiki/

[৫]Thompson, Paul. 2000 (3rd edition), The Voice of the past oral history, Oxford University press, New York, p. 2-26

[৬]দেখুন : পাহাড়ীদের স্মৃতিতে ভাস্বর প্রিয় নেতা এম এন লারমা, প্রদীপ চৌধুরী, ১০ নভেম্বর ২০১১, http://www.banglanews24.com

[৭]দেখুন, সোহরাব হাসান (২০১০) : শ্রদ্ধাঞ্জলি শহীদ এম এন লারমার সংগ্রাম, এটি দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয় ১১ নভেম্বর ২০১০।

প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক ভিত ও পাটাতন মজবুত করেছিল তার সামাজিক ঐতিহাসিকতা ও পাহাড়ের প্রতিবেশ। আর সেখান থেকেই তিনি পরিচয় ঘিরে রাষ্ট্রের অবধারিত বলপ্রয়োগকে প্রশ্ন করেছিলেন। ক্ষমতা কাঠামোর উপস্থাপন-রাজনীতির বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন নিম্নবর্গের পাল্টা জনভাষ্য। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পরিচয়ের রাজনৈতিক তর্ক তুলেছিলেন রাষ্ট্রীয় দরবারে। যে পরিচয়-বিতর্কের সুরাহা এখনো হয়নি। দেশের প্রায় আধ কোটি আদিবাসী জনগণ নিরন্তর বাঙালি রাষ্ট্রে আত্মপরিচয়ের এ সংগ্রাম জিইয়ে রেখেছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার একটি সংসদীয় বিতর্ককে চলতি আলাপে টেনে আমরা পরিচয়ের রাজনৈতিক পরিসরটি টানতে চাইছি। এ বিতর্ক ১৯৭২ সনে উত্থাপন করেছিলেন মানবেন্দ্র স্বাধীন দেশের সংসদে[৮]। ১৯৭২ সনের গণপরিষদ সভায় তৎকালীন মাননীয় স্পীকার দেখা গেছে কোনো বাঙালি সাংসদের নাম ভুলভাবে বা বিকৃত করে উচ্চারণ করেননি, একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাড়া। এটি হয়তো মাননীয় স্পীকারের কোনো 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দোষ বা রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়' কিন্তু এই ব্যবহার ও চর্চা স্পষ্ট করে তুলে রাষ্ট্রের জাতি-ক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র ও বৈষম্যমূলক মনস্তত্ত্ব। এটি বঞ্চনার শর্ত আরোপ করে এবং নিপীড়নের নির্ধারণকে চূড়ান্ত ও বৈধ করে। আর এই বৈষম্য উপনিবেশিক তাকেও মূর্ত করে, কারণ কিভাবে কাউকে ডাকা হয় এবং কী নামে ডাকা হচ্ছে তা কিন্তু উপনিবেশিকতার ঐতিহাসিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সচরাচর দেখি রাষ্ট্রে কোনো বাঙালি মুসলিম পুরুষের নামকে ভুলভাবে উচ্চারণ কি নথিভুক্তকরণের কী বিপদ! সচরাচর এক্ষেত্রে সকলেই সাবধান থাকে বা থাকতে হয় বা এই সাবধানতার নামই 'জাত্যাভিমান'। তাই দেখা যায়, কোনোভাবেই শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, মেজাফ্ফর আহমেদ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আহমেদ, সেলিনা হোসেন এসব ঐতিহাসিক নামসমূহ উচ্চারণ ও নথিভুক্তকরণে 'সাবধানতা' বজায় রাখা হয়। যত অসাবধানতা গরিবের নামে, নিম্নবর্গের নামে। তখন বিষয়টি হয়ে যায় 'ব্যাকরণগত তর্ক'। আদিবাসীদের নাম ভিন্নভাবে লেখা নিয়ে এমন তর্কে অনেকেই বলেন, নাম হলো বিশেষ্যপদ, বিশেষ্যপদ এর বানান কখনো ভুল হয় না। 'ব্যাকরণের' মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করিয়ে এখানে বারবার ঢেকে ফেলা হয় 'বাঙালি জাত্যভিমান'। এমনও অনেক দেখেছি বিদ্যালয় থেকে বাঙালি শিক্ষকেরা আদিবাসী শিশুর নাম যেভাবে যে বানানে খাতা ও সনদে লিখে দেন শেষমেষ তার পারিবারিক নামটি হারিয়ে 'বাঙালি শিক্ষকের জাত্যভিমানযুক্ত' নতুন একটি ভুল নামই সারাজীবনের জন্য অনেককে বহন করতে হয়। কেউ যদি বলে থাকেন, এসব আবার উল্লেখ করার মতো কোনো ঘটনা হলো? তাহলে বুঝতে হবে তিনি এক জটিল করপোরটে সাম্প্রদায়িকতাকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ একজন মানুষের আত্মপরিচয়কে যখন গলা টিপে ধরা হয়, তাকে প্রশ্ন না করে বৈধকরা অন্যায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই অন্যায়কে প্রশ্ন করেছেন। আসুন আমরা ১৯৭২ সনের ২৫ অক্টোবরের একটি গণপরিষদ বিতর্ক[৯] থেকে সেটি দেখে নিই:

জনাব ডেপুটি স্পীকার : ..... *এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।*

শ্রী লারমা : *মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বার বার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। মাননীয় স্পীকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বার বার বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাঁধা দিচ্ছেন। যার ফলে আমি আমার .....*

জনাব ডেপুটি স্পীকার : *আপনাকে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই।- আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য।*

শ্রী লারমা : *এরপর, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সব সময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা- পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়।*

পরিচয় ঘিরে রাষ্ট্রের জাত্যভিমানী দেনদরবার দেশের জাতিগত নিম্নবর্গের 'জাতীয়তার নির্মাণ-বিনির্মাণ' প্রশ্নে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরে আরো জটিল হয়েছে। হয়েছে বৈষম্যমূলক। একজন চাকমা কি কোল বা লালেং কি কড়া বা কন্দ কি মুন্ডা বা কোচ যে কোনোভাবেই 'বাঙালি' নয়, এটি রাষ্ট্র বুঝতে চাইছে না। রাষ্ট্র জোর করে পরিচয়ের অন্যায় ব্যাকরণ চাপিয়ে দিচ্ছে আদিবাসী জনগণের উপর। 'উপজাতি', 'নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী', 'সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'ট্রাইবাল', 'এবরিজিনাল' এরকম নানান পরিচয়মূলক প্রত্যয় দিয়ে রাষ্ট্র পরিচয়-রাজনীতির জাতিগিরি বহাল রেখেছে।

সব কিছুই বদলাবে, কিন্তু কে কেন কিভাবে বদলাবে?

আমরা জানি কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। অরণ্য কি নদী, মানুষ কি পাহাড়, নৃত্য কি গীত কোনোকিছুই। সব কিছুই পাল্টে যায়, বদলায়, রূপান্তরিত হয়, হয় বিকশিত ও ঘটে বিনির্মাণ। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে বলপ্রয়োগ করে যখন একতরফাভাবে এ বদলাবদলির রেওয়াজ চালু থাকে তখন একে প্রশ্ন করাটা জরুরি। কারণ এটি জনগণের বিকশিত জীবনের এক রাজনৈতিক শর্ত। দেখা যায়, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণের দেয়া পাহাড়, অরণ্য, জলধারা, নদী কি অঞ্চলের নামগুলো পাল্টানোর এক প্রশ্নহীন

[৮]বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় : সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭২
[৯]প্রাগুক্ত। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

রাষ্ট্রীয় জুলুম চালু আছে। কুর্মী আদিবাসীরা ছিল বলে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গার নাম কুর্মীটোলা, এখানেই স্থাপিত হয় প্রথম বিমানবন্দর। কুর্মীদের স্মৃতি নিয়ে জায়গাখানি এখনও টিকে আছে, কিন্তু এখানে কুর্মীরা নেই। মণিপুরীদের অঞ্চল বলেই মণিপুরীপাড়া, রাখাইনদের বসত ছিল বলেই মগবাজার। দেশের রাজধানী কি কুর্মীটোলা, মগবাজার আর মণিপুরীপাড়াকে অস্বীকার করতে পারবে? বিস্ময়করভাবে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এসব অঞ্চলের নাম এখনও তিন আদিবাসী জাতির স্মৃতি নিয়ে টিকে আছে। হয়তো এসব নাম বদলে যায়নি এখানে উল্লিখিত আদিবাসীরা আর নেই বলে। আদিবাসীদের নামসমূহ তাই হয়তো এখন এখানকার অধিবাসী বা অধিপতি রাষ্ট্রের কাছে আর কোনো মানে দাঁড় করাচ্ছে না। কিন্তু আমরা দেখেছি খুব সচেতনভাবে, রাজনৈতিক কায়দায় দেশের অধিকাংশ আদিবাসী অঞ্চল ও আদিবাসী স্মৃতি জড়িত বহমানতাকে বদলে ফেলা হয়। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন (২০০৮) তাঁর একটি লেখায় জানান, *শুনছি আর একজন সচেতন পাহাড়ী আদিবাসীর এমন আর্তনাদ আমাদের জায়গাগুলোর নাম বদল করে ফেলা হচ্ছে। যেমন নান্যেচর হয়েছে নানিয়ারচর। আলেয়াখাদ্যং হয়েছে আলীকদম। মেইনীদোর হয়েছে মাইনীমুখ। বান্দ্যাল্যা হয়েছে বাঙালহালিয়া। খুঁইমারা হয়েছে কুকিয়ামারা। এমন আরও আছে। এসবই সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে এবং অধিকার লংঘিত হয়। জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ছোট ছোট উপাদানে পরিপূর্ণ থাকে। চলমান জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় এইসব উপাদান রূপান্তরিত হয়েছে। রূপান্তর চলমান প্রক্রিয়ার ধর্ম। শুধু দেখতে হয় সেটা জীবনের সত্যের পক্ষে কিনা। কিন্তু সব সময় এ সত্য সত্য থাকে না। আদিবাসীদের জীবনে সংস্কৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থে রূপান্তরিত হয়নি। আঘাত এসেছে তাদেরকে বিপর্যস্ত করতে। আঘাত এসেছে তাদের বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিতে*[১০] ।

দেশের উত্তর-পূর্ব হাইড্রলজিক্যাল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রিক এক নদীর নাম সিমসাং। নেত্রকোণার দূর্গাপুর সীমান্ত অঞ্চলে যা প্রবাহিত। মান্দি আদিবাসীর কাছে এ নদী বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মান্দিদের মতে, সিমসাং মাহারীর (বংশ/গোত্র) জন্ম হয়েছে এ জলপ্রবাহ থেকেই। প্রশ্নহীনভাবে বাঙালিরা এ নদীর নাম দিয়েছে সোমেশ্বরী। মান্দি ভাষায় একটি গানে বিষয়টি এসেছে এভাবে, ...মান্দি এলাকায় বয়ে যায় এক বড় নদী, মান্দিরা বলে সিমসাং আর বাঙালিরা নাম দিয়েছে সোমেশ্বরী। নেত্রকোণার কলমাকান্দার সীমান্তে প্রবাহিত আরেক পাহাড়ী নদীর নাম রংদী। মান্দি ভাষায় পরিচিত এ নদীটিও নাকি মান্দিদের রংদী মাহারীর জন্মকথার সাথে জড়িত। দুঃখজনকভাবে এ নদীর নাম পাল্টে দিচ্ছে বাঙালিরা। নদীটি হাজং আদিবাসীদের কাছে গণেশ্বরী নামে পরিচিত হলেও সাম্প্রতিককালে একে 'লেঙ্গুরা নদী' নামেই প্রতিষ্ঠার বাঙালি-বলপ্রয়োগ শুরু হয়েছে। এককালে নেত্রকোণার কলমাকান্দার লেঙ্গুরা অঞ্চল মান্দি, হাজংদের অঞ্চল থাকলেও বহিরাগত বাঙালিরাই এখন এখানকার মূল বাসিন্দা। অধিকাংশ আদিবাসী বসত উচ্ছেদ ও দখল হয়েছে। নদীও তাই আগের নাম ঠিকানা হারিয়ে নতুন নামে বদলে যেতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে বলতে পারে, এতে কী যায় আসে? জলে কি আর নাম লেখা থাকে নদীর? নদী তো ঘাটে ঘাটে, গ্রাম থেকে গঞ্জে, পাহাড় থেকে সমতলে ধারায় ধারায় তার নাম পাল্টায়। *হিমালয়ের উত্তরাংশের তিব্বত অংশের বুরাংয়ের আংশি হিমবাহ থেকে ঐতিহাসিক ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি। তিব্বতে ইয়ারলুং সাংপো, ভারতের অরুণাচলে সিয়াং, আসামে বোরো আদিবাসীদের বুরলুং বুত্তরই আমাদের ব্রহ্মপুত্র*[১১]। এই যে এক এক দেশে এক এক বাঁকে ব্রহ্মপুত্রের এক এক নাম, এটি তো এক ঐতিহাসিক সত্য, এটি বিজ্ঞান। নদী ও জনজীবনের সম্পর্কের বিজ্ঞান। কিন্তু যখন জোর জবরদস্তি করে এর নাম পাল্টে দেয়া হয়, যখন সকল বহমান স্মৃতি আখ্যান মুছে দেয়া হয়, তখন সেটি আর সত্য থাকে না। বিজ্ঞান থাকে না। হয়ে ওঠে নিপীড়নমূলক অন্যায়। জাত্যভিমানী। বাংলাদেশে এই জাত্যভিমান প্রশ্নহীন কায়দায় বহমান আছে। রাষ্ট্র একে কোলে কাঁখে করে মোটাতাজা করছে।

পটুয়াখালীর সাগর ঘেঁষে রাখাইনরা এককালে গড়েছিল আপন জনপদ ক্যানছাই চুয়ান। বহিরাগত বাঙালিরা যার নাম দিয়েছে কুয়াকাটা। কক্সবাজারের রামুর রাখাইন নাম প্যাঙওয়া বা হলুদ ফুলের দেশ। শেরপুরের ঝিনাগাতি উপজেলার শালবনের ভেতর এক মান্দি বসতির নাম 'গাজিনি সঙ'। গাজিনি সঙ মানে গাজিনি মানে গাজি নামের কোনো ব্যক্তি, তার নামেই সেই সঙ বা গ্রামের নাম। কিন্তু বাঙালি বনবিভাগ ও বাণিজ্যিক পর্যটনের জন্য ঐ এলাকা 'গজনী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেছে। মান্দি হাজং বসত উচ্ছেদ করে গড়ে তোলা হয়েছে 'গজনী অবকাশ কেন্দ্র'। বান্দরবানের রুমা উপজেলার রেমেক্রী-প্রাংসা ইউনিয়নেই বাংলাদেশের সবচে' উঁচু পাহাড়গুলোর অবস্থান। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড়টির যে নামটি সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছে 'তাজিংডং' নামে তা মারমা ভাষার শব্দ। মারমা ভাষায় ত-জিং-টং মানে সবুজ পাহাড়, বম এবং মিজো আদিবাসীদের ভাষাতে এর নাম চিং চির ময় ক্লাং। বাঙালিরা একবার এর নাম দিয়েছিল 'বিজয়' এবং এই নাম বদলে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ছিল। ক্যাক-ক্রো-টং পাহাড়টির নামও মারমা ভাষার, মানে হল পাহাড়ের শীর্ষদেশ। বম ও মিজো ভাষাতে এর নাম ক্রেওক্রাক্লাং। কিন্তু বাঙালি উচ্চারণে এ পাহাড়টিও আজ 'ক্রেওক্রাডং' নামে পরিচিত।

নাম যে বদলে যাচ্ছে, বদলায় তার সরাসরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো দেশের আদিবাসী অঞ্চলে 'মোহাম্মদপুর, রসুলপুর, মিয়াপাড়া, নবীনগর, নতুনপাড়া, বাঙালিপাড়া, সেটেলারপাড়া, মুসলিমপাড়া, সেকান্দারনগর' এরকম নিত্যনতুন নাম ও প্রত্যয়ের আমদানি। বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তরাঞ্চল, উপকূলীয় জনপদ, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল ও ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা সকল অঞ্চলের জন্যই

[১০]সেলিনা হোসেন, পাহাড়ী জনপদে জীবনের অন্বেষা, লেখাটি নেয়া হয়েছে 'জুম পাহাড়ের জীবন' শীর্ষক পুস্তক থেকে, এটি সম্পাদনা করেছেন মহিউদ্দিন আহমেদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান, খ.ম. আবদুল আউয়াল ও রাশেদ ইকবাল, এটি প্রকাশ করেছে সিডিএল, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৩০-৩১

[১১]দেখুন : আহা ব্রহ্মপুত্র, পাভেল পার্থ, দৈনিক সমকাল, ঢাকা, পৃ. ৪, ৬ অক্টোবর ২০১৩

সত্য। বৃহত্তর বাঙালি পরিসরে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের 'খাসিয়া' হিসেবে পরিচিত খাসি জনগণ টিলা অরণ্যে নিজেদের বসতিকে 'পুঞ্জি' বলে থাকেন। বহিরাগত বাঙালি, বনবিভাগ, চাবাগান কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিনে এসব খাসিপুঞ্জি অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ ও দখল করে চলেছে। বৈরাগীপুঞ্জি, শ্রীবাড়িপুঞ্জি, চাতলাপুঞ্জি, শীতলাপুঞ্জি, জোলেখাপুঞ্জি, বরমচালের রিজার্ভপুঞ্জি, তাহেরাপুঞ্জি, জাগছড়াপুঞ্জির মতো অনেক ঐতিহ্যবাহী খাসিপুঞ্জির আর কোনো হদিশই নেই দুনিয়ায়। খাসি বসত উচ্ছেদ করে এসব পুঞ্জির নাম পাল্টে দেয়া হয়। এই যে বদলাবদলি ও পাল্টাপাল্টির একতরফা জাত্যভিমানী জবরদস্তিতার আমূল বদল জরুরি। রাষ্ট্র ও অধিপতি কাঠামোকে এ ধরণের জবরদস্তিমূলক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান খারিজ করা উচিত। নিম্নবর্গের পরিচয় ও উপস্থাপন ঘিরে রাষ্ট্রের অবস্থান ও রাজনৈতিক-দর্শনের আমূল বদল জরুরি। পাশাপাশি জাতিগত-নিম্নবর্গের পরিচয়-সংগ্রামকেও আরো জোরালো ও জীবনজয়ী করে তোলা দরকার।

গ্রন্থনের দায় ও নিম্নবর্গের বিবাদ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক দর্শনকে সঙ্গী করে বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণ ও রাষ্ট্রের ভেতর পরিচয়ের রাজনীতি ও ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আমরা যে আলাপটি তুলেছি, এখন আমরা সেই আলাপটিকে শেষের দিকে টানছি। রাষ্ট্রে মান্দিদের 'গারো', লালেংদের 'পাত্র', ম্র বা ম্রোদের 'মুরং', লেঙ্গামদের 'গারো-খাইস্যা', মুন্ডাদের বুনো, সাঁওতাল- কোল-মাহাতোদের এককভাবে সাঁওতাল, মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের এককভাবে 'মণিপুরী' নামে পরিচয়করণের একটি চল আছে। পাশাপাশি প্রতিটি জাতিরই রয়েছে নিজ জাতি ভিন্ন অপর জাতিকে পরিচয় ও চিহ্নিতকরণের নিজস্ব কায়দা। যেমন, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির সাজেক উপত্যকার লুসাইরা চাকমাদের তাকাম নামে ডাকেন। বাঙালিদের বলেন ভাই। ত্রিপুরাদের তারা তুইকুক বলেন। মারমাদের বলেন কল্ মানে কোনো পরিচয় নাই। কুকিদের কুকি, পাংখোদের পাংখো, বমদের বম নামেই ডাকেন। বাংলাদেশের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' এ দেশের মোট ২৯ আদিবাসী জাতির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[১২]। উক্ত তালিকা নিয়ে বিতর্ক ওঠেছে। এখানে অনেক আদিবাসী জাতির নাম বাদ পড়েছে। পাশাপাশি উসুই, মালপাহাড়ী ও মং নামগুলিকে স্বতন্ত্র আদিবাসী জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোনোভাবেই সঠিক নয়। রাখাইন ও মারমা জাতিদের ভেতর মং নামের পর পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মালপাহাড়ী ও পাহাড়ী বা পাহাড়ীয়া একই জাতি এবং উসুই হচ্ছে ত্রিপুরা জাতির একটি ভাগ। সম্প্রতি উক্ত তালিকা সংশোধনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু আবারও বিতর্ক ওঠেছে রবিদাসদের নিয়ে। রবিদাসরা কি আদিবাসী জাতি হবেন নাকি দলিত জনগোষ্ঠী হবেন? এ নিয়ে পুস্তকি বিশেষজ্ঞ বিশেষত রাষ্ট্রকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানী এবং রবিদাসদের ভেতর এক দ্বান্দ্বিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি হয়তোবা বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক 'সংঘাতের' দিকেও যেতে পারে। আমরা আশা করবো রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের এ অধিকার সুরক্ষা করা জরুরি, যে, কোনো নাগরিক তার জাতি-লিঙ্গ-বর্ণ ও ধর্মের কি পরিচয় সে নিজে দাঁড় করাতে চায় সেখানে স্বাধীনতা থাকা উচিত। একে রুদ্ধ করা অন্যায়। জাতি, জাতীয়তার কোনো নির্দিষ্ট একপাক্ষিক অপরিবর্তনশীল সংজ্ঞা নেই। জীবনের ঐতিহাসিকতাকে সংজ্ঞায়নের বাহাদুরিতে কি আমরা আবদ্ধ করে রাখতে পারবো?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা ও কাজের সূত্রেই আজকের আলাপটিকে আমরা এতোটা টানতে পেরেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় সংগঠক ছিলেন তিনি। আজকের আলাপে আমরা এমনি আরেক অবিস্মরণীয় মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গ টেনে আলাপটিকে শেষ করে দিব। কাকেত হেনইঞতা। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ৫নং সেক্টরের লক্ষীপুর ক্যাম্পের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন খাসি বীর নারী কাকেত হেনইঞতা। প্রথমদিকে মুক্তিসেনাদের দেখাশোনা, খাবার ও অস্ত্র যোগান দেয়ার পাশাপাশি যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর মুক্তিসেনাদের পৌছানোর দায়িত্ব নেয়ার পর প্রায় বিশটিরও বেশি সম্মুখ যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তৎকালীন ৫নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত আলীর তত্ত্বাবধানে মহব্বতপুর, কান্দারগাঁও, বসরাই-টেংরাটিলা, বেনিংগাঁও-নূরপুর, পূর্ববাংলাবাজার, সিলাইড় পাড়, দোয়ারাবাজার, টেবলাই, তামাবিল এলাকায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন কাকেত। ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে পাকহানাদার বাহিনীর আগমন ঠেকানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা জাউয়া সেতু উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যার অন্যতম একজন কাকেত। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনী তাকে আটক করে এবং ভয়াবহ নির্যাতন চালায়, তার সারা শরীরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার জিরারগাঁও এলাকায় তিনি 'খাসিয়া মুক্তি বেটি' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বাঙালি রাষ্ট্রের গণমাধ্যম যখন তাকে খুঁজে পায় এবং তথাকথিত 'মূলধারার' সাথে মানে বাঙালিদের সাথে কাকেতর পরিচয় ঘটায় তখন বিস্ময়করভাবে কাকেত হেনইঞতাকে বানানো হয় 'কাঁকন বিবি'। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রসীমানায়। রাষ্ট্র যাদের জোর করে কাঁকন বিবি বানায় আসুন রাষ্ট্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রবল আওয়াজ তুলি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতো। বলি, আমাদের নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা বা কাঁকন বিবি নয়। আমাদের নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও কাকেত হেনইঞতা। এটিই জনগণের পরিচয়ের ব্যাকরণ ও কারিগরি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যা শুরু করেছিলেন এই রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে, আপন রাজনৈতিক দর্শন ও বীক্ষায়।

*গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ। animistbangla@gmail.com

[১২]ধারা ২(১) এবং ধারা ১৯, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, বাংলাদেশ।

মহান নেতা এম এন লারমা ঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

ধীর কুমার চাকমা

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে জুম্ম জাতির অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আট সহযোদ্ধাসহ শহীদ হয়েছিলেন। সেদিন জুম্ম জাতি হারিয়েছে তার জাতীয় চেতনার অগ্রদূতকে; পার্বত্য চট্টগ্রাম হারিয়েছে তার এক কৃতী সন্তানকে; বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ হারিয়েছে এক যোগ্য সাংসদকে; দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ হারিয়েছে তাদের এক ঘনিষ্ট সহযোদ্ধাকে; পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মীরা হারিয়েছে তাদের পথপ্রদর্শককে। সর্বোপরি বিশ্বের মেহনতি মানুষ হারিয়েছে তাদের এক অকৃত্রিম বিপ্লবী বন্ধুকে।

১০ নভেম্বর ২০১৬ মহান নেতার ৩৩তম মৃত্যু দিবস ও জুম্ম জাতির জাতীয় শোক দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও এ দিবসে জুম্ম জাতি তার প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জুম্ম জাতি প্রয়াত নেতা এম এন লারমার নেতৃত্ব ও আদর্শের কাছে ঋণী। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজ জীবনের রঙিন স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন। যাদের মহান আত্মত্যাগ এই পার্টির নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে মহান নেতা এম এন লারমাসহ অন্যান্য শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি। মহান নেতার মৃত্যুর পর আন্দোলন ক্ষণিকের জন্যও থেমে থাকেনি। তাঁর গড়ে তোলা গতিশীল নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। '৮৩-র অনাকাঙ্খিত গৃহযুদ্ধের মতো কঠিন বিপর্যয় পেরিয়ে এম এন লারমার যোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান পার্টি সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মহান নেতা এম এন লারমার জীবন দর্শন থেকে আমরা এগিয়ে চলার দিশা খুঁজে পাই। তাঁর জীবন দর্শন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস। এরকম একটি পশ্চাৎপদ সমাজ এবং অসংগঠিত ও ঘুমন্ত জাতিকে নিয়ে এত বড় একটা মহান আন্দোলন সংগঠিত করা সেটা একমাত্র এম এন লারমার মতো বিচক্ষণ নেতার পক্ষে সম্ভব ছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর অনুজ ও বর্তমান পার্টি সভাপতি সন্তু লারমা জেলে থাকাকালীন সময়ে, ১৯৭৭ সালের প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলন সফল সমাপ্তি লাভ করেছিল এম এন লারমার বলিষ্ট নেতৃত্বে। তখনো '৮৩ সালের চক্রান্তকারীরা বিভেদের ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তখন সে যাত্রায় চুপচে যায়, পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহণের কৌশল হিসেবে। পার্টির দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে অবৈধ পন্থায় চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টিকে নেতৃত্বহীন করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে তাদের সেই কুট-উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

১৯৮২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন বিভেদপন্থীরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে পার্টি নেতৃত্বকে দুই ভাই-এর পার্টি বলে মিথ্যা অপবাদ দিতে থাকে; কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সমর্থন আদায়ের জন্য। কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলে পার্টির বিরুদ্ধে তথাকথিত দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে। কংগ্রেসে যথারীতি পার্টির তৃতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সম্ভাব্য প্যানেল উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিভেদপন্থীদের প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচিত হয়ে যায় বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির উত্থাপিত প্যানেল এবং মহান নেতা পুনরায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

জুম্ম জাতি অসময়ে তাঁকে হারালেও তাঁর কর্মযজ্ঞ হারিয়ে যেতে পারে না, যা আজো সজীব হয়ে জুম্ম জাতিকে উজ্জীবিত করে। প্রতি দশই নভেম্বরে তারই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে, দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড় ও সমতলে। তাই এম এন লারমার প্রতিষ্ঠিত পার্টি জনসংহতি সমিতি জাতীয়- আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান পার্টি সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ১৯৭৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ধৃত হয়ে কারাগারে প্রেরিত হন। তিনি কারাগার থেকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই ১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারি কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই তিনি ফের অলঙ্কৃত করেছেন পার্টিতে তাঁর যোগ্য আসন; যে আসনে বসার স্বপ্ন দেখতো চার কুচক্রীরা। সন্তু লারমার কারামুক্তির পর তাদের দিবা-স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তবুও পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখল তথা সাধের 'সুরতন রাজ্য' প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার কারামুক্তি পর্যন্ত চার বৎসরাধিক কাল ধরে এম এন লারমা প্রতিকূল পরিবেশেও শক্ত হাতে আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট এম এন লারমা গেরিলা জীবনে পদার্পণ করেন।

বস্তুর বিকাশ যেমনি অসম, মানুষের চিন্তাধারার বিকাশও অসম। যার জ্ঞান সবচেয়ে গভীর এবং জীবন জগৎকে ব্যাখ্যা করে নিজেদের অবস্থান ও চারদিক নির্ণয় করতে সক্ষম তিনিই হয়ে থাকেন চৌকস এবং অগ্রগামী। অন্যরা এই অগ্রগামীদের অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সম্মুখে এগিয়ে আসে। কিন্তু চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের সেভাবে এগিয়ে আসার ধৈর্য ছিল না। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তারা দিগ-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। তারপরও প্রয়াত নেতার সাথে সেরকম অনেক নেতা-কর্মী ছিলেন যারা আন্দোলনে তাদের ছোট-বড় দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্থান বেছে নিতে সক্ষম ছিলেন। তাই পার্টির নীতি-আদর্শের প্রতি অটল থেকে পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরণ-পণ লড়াই সংগ্রাম করেছিলেন। নিজেদের জীবন-জীবিকার ব্যাপারে ছিলেন চরম উদাসীন আর পার্টির নীতি-আদর্শের প্রতি তারা ছিলেন গভীর আস্থাবান। পার্টি বাঁচলে আন্দোলনও বাঁচবে, এই মূলমন্ত্র নিয়ে রোগ-শোক, অভাব-অনটনের মধ্যেও রাত-দিন অভেদ করে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। বয়োসন্ধিক্ষণে তাদের কেহ কেহ আজো অনুরূপভাবে আন্দোলনে সামিল রয়েছেন। পার্টিই তাদের কাছে জীবনের সর্বস্ব।

পার্টির্র নীতি-আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে পারা আর গ্রহণ করা এক কথা নয়। সেদিন মহান নেতার সাথে শহীদ আট সহযোদ্ধা রক্ত দিয়ে সেকথার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বিপরীতে এক সময় যারা বিশ্বনন্দিত রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী নেতা ও দার্শনিকদের তত্ত্ব অনর্গল আওড়িয়ে নিজেদের জনদরদী রাজনৈতিক নেতা বলে জাহির করতো তারাই পার্টির মুখে চুনকালি মেখে এম এন লারমার হত্যাকারী হিসেবে জাতিকে কলঙ্কিত করেছে। যারা পার্টির নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে পারে। নিজের সহযোদ্ধাদের উপর নৃশংসভাবে গুলি চালাতে হাত কাঁপে না। তাদের এই জাতিদ্রোহিতা জুম্ম জাতি ভুলে যেতে পারে না। ১০ নভেম্বর '৮৩ থেকে উচিত শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত নবীন প্রজন্ম যত্নবান হবে বলে জুম্ম জাতি আশা করে।

১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গণে এম এন লারমার আবির্ভাব ঘটেছিল। বলা যায় তখনই পার্টি গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তর তিনি স্থাপন করেছিলেন। এই ভিত্তির উপরই পার্টি-ইমারত গড়ে উঠে। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষে ১৯৭০ সনে স্বায়ত্তশাসনের দাবির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। তার পরবর্তী ইতিহাস কারো অজানা নয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর নাম জুম্ম জনগণেরই প্রদত্ত নাম। জুম্ম জনগণ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে বাহিনীর নাম দিয়েছে শান্তিবাহিনী সেই বাহিনী হচ্ছে নিঃসন্দেহে জুম্ম জনগণেরই বাহিনী। শান্তিবাহিনী ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়। বলা বাহুল্য জুম্ম জনগণের সার্বিক সহায়তা না পেলে এরকম একটা পার্টির পক্ষে দ্বি-দশকাধিক কাল ধরে দেশের মাটিতে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এন লারমা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট চারদফা দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করেছিলেন। তার পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান বিল উত্থাপনের সময় বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের কথা সংবিধানে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন এম এন লারমা। জুম্ম জনগণের কোন দাবিই গ্রাহ্য না হবার ফলশ্রুতিতে জুম্ম জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে সূচিত হয় সশস্ত্র আন্দোলন।

এম এন লারমা বলতেন, "পার্টির সাথে কেহ একমত হতে না পারলে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণকে পার্টি অভিনন্দন জানিয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতীয় স্বার্থে যদি আমাকেও পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে হয় তাতে আমি স্বেচ্ছায় পার্টি থেকে সরে যেতে রাজি আছি। পার্টি এবং জনগণের স্বার্থে সেটাই মঙ্গলজনক"। পার্টির দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে একথা বললেও মহাসম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তিনি দ্বিতীয় বারের মতো পার্টি সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সভাপতি থাকা অবস্থায় তিনি ১০ নভেম্বরে শহীদ হন। জুম্ম জাতি অসময়ে তাঁকে হারালেও তাঁর কর্মযজ্ঞ হারিয়ে যেতে পারে না, যা আজো সজীব হয়ে জুম্ম জাতিকে উজ্জীবিত করে। প্রতি দশই নভেম্বরে তারই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে, দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড় ও সমতলে। তাই এম এন লারমার প্রতিষ্ঠিত পার্টি জনসংহতি সমিতি জাতীয়-আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

জনগণই শক্তির মূল উৎস। জনগণ যে পন্থা সমর্থন করে সেই পন্থাই চির অপরাজেয় হয়। বলা হয়ে থাকে ট্রৎস্কী না হলে নাকি রাশিয়ায় লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা পেতো না। অথচ সেই ট্রৎস্কীই লেনিনের বিরুদ্ধে রিভলভার তাক করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের ইতিহাস থেকে লেনিনের নাম মুছে যায়নি। কিংবা লেখা হয়নি লেনিনের জায়গায় ট্রৎস্কীর নাম। বাতিল হয়নি লেনিনবাদ প্রচার আন্দোলন। তারপরও এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছিল লেনিনবাদ। ১৯২০ সালে ভারত এবং চীনের কমিউনিষ্ট (মার্কসিস্ট-লেনিনিষ্ট) পার্টির জন্ম হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ বোস না থাকলে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম ত্বরান্বিত হতো না। সেখানে নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সে যুদ্ধে ব্রিটিশ দুর্বল হলে তবেই '৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশের পতাকার জায়গায় তেরঙা পতাকা উড্ডীন হয়। এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে এম এন লারমার নেতৃত্বের হাতকে মজবুত করেছিল। তাই এম এন লারমা সত্যিকার অর্থে মহান নেতা। তাঁর নাম ভাঙিয়ে কোন সংগঠন ঘোষণা দিলেই তাকে এম এন লারমার পার্টি বলে গণ্য করা যায়

না। তবে সাময়িকভাবে সাধারণ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে। কথায়-কাজে এম এন লারমা ও তার পার্টি সংগঠনের পরিচয় আজো জনগণের অন্তরে গ্রথিত রয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আজো বারে বারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকারী পার্টি তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকেই তাদের আন্দোলনের নেতা বলে বিশ্বাস করে।

পাহাড়ের বুক চিড়ে নেমে এসেছে কুলুকুলু রবে বয়ে যাওয়া ঝিরির ছোট্ট-ছড়া। ছড়ার শুভ্র জলে স্নান সেরে উঠে শ্রদ্ধেয় স্যার (প্রয়াত নেতা এম এন লারমা, জুনিয়র কর্মীরা ডাকতেন বড় স্যার) বসলেন ছড়া পাড়ের পাক ঘরের মাচাঙ-এ, যেখানে সবাই বসে ভাত খেতাম। খাবার শেষে পাক ঘরের খামে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেদিন আমিই বাবুর্চি। সবাই খেয়েছে কিনা, আরো ভাত-তরকারী ইত্যাদি আছে কিনা জানতে চাইলেন। সব ঠিক আছে বলে জানানো হলো। এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলেন। "আমরা এক পাতিলার রান্না এক পাতে বসে খাই, একই চালের নীচে ঘুমাই, তবুও আমাদের মধ্যে কেন এতো তফাৎ" তার এই আক্ষেপ করে বলা প্রশ্নের উত্তর তার রক্তের আকরে লিখে দিয়ে গেছেন। আসলে সেদিন অতি সংক্ষেপে আদর্শগত ঐক্যের কথা বলেছিলেন। জীবদ্দশায় তার কথার গুঢ় রহস্য সেদিন আমরা হয়তো আবিস্কার করতে চাইনি। কথায়, কাজে, চিন্তায় ঐক্যের কথা তিনি প্রসঙ্গক্রমে প্রায় বলতেন।

আদর্শের মিল না থাকলে অন্য কোথাও ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বেতাল সংসার যেমনি ঝামেলার আকর তেমনি নীতি-আদর্শহীন সংগঠনও তাই হয়ে থাকে। জাতীয় স্বার্থে আদর্শগত ঐক্য অনস্বীকার্য। তাই পার্টির মধ্যে '৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের ঘটনা জুম্ম জাতির জন্য কখনো প্রত্যাশিত ছিল না। এটা হচ্ছে দীর্ঘ বছর ধরে যে জুম্ম জাতি পার্টির উপর অবিচল আস্থা-বিশ্বাস রেখে এসেছিল সেই জুম্ম জাতির সাথে প্রতারণার সামিল।

পার্টির একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। জানি না বিভেদপন্থীরা এখন নিজেদের কী মনে করেন। কিন্তু জুম্ম জাতি এখন বড় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়গ্রস্ত। আসল-নকল চিনতে তাদের সবক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা এখন 'দইকে চুন' বলে মনে করে। আগের দিনে পার্টির কর্মসূচিকে জুম্ম জনগণ ধ্যান-জ্ঞান করেছে। পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণ ছিল একাট্টা। এখন নব্য বিভেদপন্থীরা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে করেছে বহুধা-বিভক্ত। একক ও একমুখী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে জুম্ম জনগণের ঐক্যশক্তিতে দ্বিধা-বিভক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের।

আদর্শগত ঐক্য কর্মীদের নানা কথা, নানা আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। একমাত্র নিবিড় পর্যবেক্ষণেই তা বুঝা যায়। তিনি দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঐক্যের কথা উত্থাপন করতেন। আদর্শগত ঐক্য না থাকলে কর্মীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনধারা পার্টির ঐক্যে ফাটল ধরায়। যৌথ বিপ্লবী জীবন যাপনের প্রতি অবহেলার জন্ম দেয়। তাই নতুন যাদের ভর্তি করা হতো তাদের নিয়ে পরিচালক কর্মীদেরকে রান্নাবান্নার কাজে ডিউটি দেয়া হতো, যৌথ জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবার নিমিত্তে। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে থাকা, মিলেমিশে কাজ করার মধ্য দিয়েই যৌথ নেতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে ও দৃঢ় হয়। একই সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্য এবং ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র অপচয়-অপব্যয় রোধ সম্পর্কেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হতো।

১৯৮১ সালের শুরুতে পার্টির ঐক্যে ফাটল ধরতে থাকে। '৮১ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত নেতা অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে কাঁধে করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে একই রকম আরেকজন- সংসপ্তক চাকমাকেও (হিমাদ্রী)। তারও কিছুদিন আগে দুরারোগ্য রোগে জাপানী রঞ্জন চাকমার (বিকাশ বাবু) মৃত্যু হয়। নেতা এম এন লারমা মাসখানেক ভোগান্তির পরও অসুখ সেরে না উঠায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। কাঁধে করে নিতে হবে ৪/৫ মাইল দূরে। নেবার ব্যবস্থা হলো। তাঁকে গাড়িতে উঠানো হলো। তার চিকিৎসা সঙ্গী হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়রদের মধ্য থেকে অবশ্যই একজনকে যেতে হবে। সেমুহূর্তে অন্যান্যদের মধ্যে পাশে প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) উপস্থিত ছিলেন। নেতার চিকিৎসা সঙ্গী হিসেবে তাঁকে ধরা হলেও তিনি নেতার সঙ্গে গেলেন না। আর নেতাকে চিকিৎসাতে পাঠানোর অব্যবহিত পরেই প্রকাশ কী একটা যেন কাজে ব্যারাকের বাইরের অঞ্চলে চলে গেলেন।

ইত্যবসরে এম এন লারমা চিকিৎসা শেষে ব্যারাকে ফিরে আসলেন। তার মাস খানেক পর পার্টির দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। '৮৩ সালের শেষ দিকে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি আর অসুখ সেরে উঠতে পারলেন না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আদর্শগত শিক্ষার কথা উচ্চারণ করেছিলেন এই বলে যে, "আমাকে হত্যা করে যদি জুম্ম জাতির অধিকার ফিরে আসে তাহলে হত্যা করতে পারো"। তাঁর এই উক্তিতে ঘাতকের অন্তর গলেনি। একমাত্র আদর্শভ্রষ্ট না হলে মানুষ এভাবে একজন নির্মোহ বিপ্লবী বন্ধুকে, নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে পারে না। সেদিন ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার কালো রাতের অন্ধকারে চার কুচক্রী দানবরা মহান নেতাসহ আট সহযোদ্ধাকে হত্যা করে সেই আদর্শ বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। পার্বত্য চুক্তির পর নব্য বিভেদপন্থীরাও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে পার্টির গৃহীত সকল কর্মসূচি বিরোধীতা করে দ্বিতীয়বারের মতো জুম্ম জাতীয় ও দলীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। তবুও জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণ তথা চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে একমুখী ধারায় গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি পার্টির উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আসছে। পার্টির সেই প্রয়াসকে জুম্ম জনগণ এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ সাধুবাদ জানিয়েছে। নভেম্বর মাস জুম্ম জাতির জন্য শোকাবহ মাস। প্রতি বছর এদিনে ১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। সকল অনুষ্ঠানের উপলক্ষ হচ্ছে শোককে শক্তিতে পরিণত করা; মহান নেতার অনুসৃত নীতি-আদর্শ দিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্বকে শাণিত করা। তাঁর অবর্তমানে এভাবে পার্টি তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। জীবদ্দশায় এম এন লারমা সমাজের বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কথা

বলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অহেতুক আন্দোলনকে দীর্ঘতর করার কথা বলে গেছেন সেটা বলা কিন্তু ভুল হবে। যে কোন দেশের আন্দোলনে বাস্তবমুখী বাস্তবতা আর আত্মমুখী প্রস্তুতির উপর আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী কিংবা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। শাসকগোষ্ঠীর ধনবল জনবল ইত্যাদির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতো আন্দোলনরত একটি পার্টির কোন তুলনা হয় না। উপরন্তু জুম্ম জাতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সব দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হচ্ছে জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। আন্দোলনে জয়যুক্ত হবার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে এরকম একটা সংগঠনের জন্য সময়ের প্রয়োজন। আর সেই যোগ্যতা অর্জন করাটা হচ্ছে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়াগত ব্যাপার। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনও এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়, যার ফলে আন্দোলন কখন জয়যুক্ত হবে তার আগাম সুনির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ ঘোষণা দেয়া যায় না। তবে ঈপ্সিত লক্ষে না পৌঁছা পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন করে যেতেই হয়। আর যত দ্রুত সম্ভব জনগণকে সংগঠিত করে বিভিন্ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে হয়। সেজন্য আন্দোলন নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী আর কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির কথা তিনি বলতেন। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আঞ্চলিক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ইত্যাদি অবস্থা যদি আন্দোলনের অনুকূলে হয়; একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ অবস্থাও যদি আন্দোলনের অনুকূলে বিকশিত হতে থাকে তখন দ্রুত নিষ্পত্তি অবধারিত। কখন এই অনুকূল অবস্থা তৈরী হবে সেটা অগ্রিম কেউ বলতে পারে না। কিন্তু চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা এম এন লারমার একথা তথা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের তত্ত্ব মানতে নারাজ। দীর্ঘ সময় ধরে তারা ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যেতে অপারগ। এম এন লারমা হঠকারিতার বিরোধীতা করতেন। অপরপক্ষে চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা দ্রুত নিষ্পত্তির নামে হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে। শেষ পর্যায়ে এম এন লারমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পার্টি ও জনগণকে সর্বাধিক ক্ষতি করে গেছে।

২০০৬ সালে পার্টির অষ্টম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার প্রাক-মুহূর্তে আমার এককালের প্রিয় বন্ধু চন্দ্রশেখর চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন,"ভাই, আমি দ্বিতীয় ১০ নভেম্বর চাই না"। পার্টির সাধারণ সম্পাদকের কক্ষে বসে তিনি সেদিন হঠাৎ করে কেন সেকথা বলেছিলেন জানি না। পার্টি জীবনে আমরা দু'জনে মনের কথা বিনিময় করতাম। তাই জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতির প্রাক-মুহূর্তে এক সময় আরো বলে উঠলেন, "ভাই পার্টি সভাপতির সাথে আমাকে একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দাও না"। ভাবলাম কেন তিনি বারবার সেভাবে আমার সাথে আলাপ করেন। পরিশেষে আমি বলেছিলাম,"ভাই পার্টির সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন সবচেয়ে পরস্পরের কাছে ঘনিষ্টজন। সেখানে আমার কথা কেন আসছে? কিছু একটা হয়েছে নাকি? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আস্তে করে বলে উঠলেন- না। বর্তমান পার্টি সভাপতি জে বি লারমার কারাবাসের সময় চন্দ্রশেখর আর আমি ছিলাম এক কম্বলের সাথী। ব্যারাকে অবস্থানের সময় আমাদের দুজনের আলাদা কোন কম্বল ছিল না। প্রয়াত নেতা এম এন লারমার নির্দেশিত কাজেই আমরা দুজনে ব্যস্ত থাকতাম। বর্তমান পার্টি সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা জেল থেকে না ফেরা পর্যন্ত সেভাবে কেটেছে। তিনি যখন ২০০৬ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অবসর নিলেন তখন তিনি আর আগের মতো আমার সাথে কথা বলেন না। তাই আমার আজ বার বার স্মরণ হয় প্রয়াত নেতার কথা; যে কথা তিনি প্রায় সময় বলতেন, "আমরা এক পাতিলার রান্না এক পাতে বসে খাই, একই ছাদের নীচে ঘুমাই, তবুও আমাদের মধ্যে কেন এতো তফাৎ"। আসল কথা হচ্ছে নীতি-আদর্শের কথা বুঝা আর গ্রহণ করা এক কথা নয়। বুঝবার ক্ষমতা কমবেশী সবারই থাকে। কিন্তু পালনের বা ধারণ করার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য সবার কাছে থাকে না।

১৫ পৃষ্ঠার পর

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : নবজাগরণের বাণী

উপশিরায় সম্প্রসারিত করতে জনসংহতি সমিতির প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও হাজার বছরের শ্রেণিযুক্ত সমাজে ইহার যথাযথ প্রয়োগ কঠিন। সময়ের প্রয়োজন। আবার শ্রেণিযুক্ত সমাজ না ভাঙ্গতে পারলে এই অঞ্চলে আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিগত অস্তিত ধ্বংস করতে শোষকের মারণাস্ত্র প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন নাও হতে পারে। তাই সামন্তীয় সমাজের বাঁধা অতিক্রম, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম একটি দিক। আর তা করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের প্রয়োজন যা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের রূপরেখা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বহু বছর ধরে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। পার্টির এই সংগ্রামে অর্জন জুম্ম জনগণকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এই অর্জনের অন্যতম। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ের সকল জাতির মানুষকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস নেতার নামকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে। নেতার অবাস্তবায়িত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে।

'আমি আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমি একজন নির্যাতিত অধিকার হারা মানুষ। পাকিস্তানের সময় দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর্যন্ত একটি কথাও আমরা বলতে পারিনি। আমাদের অধিকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই অধিকার আমরা পেতে চাই এবং এই চাওয়া অন্যায় নয়। সেই অধিকার এই সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মত যাতে সেই অধিকার আমরাও পেতে পারি, সেই কথাই আজকে আপনার মাধ্যমে পরিষদের নিকট নিবেদন করতে যাচ্ছি। সেই অধিকারের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়নি–যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে।'

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

এম এন লারমার সংগ্রাম ঃ নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ও করণীয়

বিনয় কুমার ত্রিপুরা

আজ শোকাবহ ১০ই নভেম্বর। ইতিহাসের স্মরণীয় বেদনাবিধুর ও কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত বিভীষিকাময় এক ভয়ঙ্কর দিন। অবিসংবাদিত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। সেই '৮৩ মর্মান্তিক ট্রাজেডি জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। ১৯৮৩ সালের এইদিনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথ প্রদর্শক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, গিরি-প্রকাশ-দেবেন- পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাৎ বরণ করেন। ঘাতকদের নির্মম বুলেটে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার খেদারছড়া থুম এলাকা রক্তাক্ত হয়েছিল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বিভেদপন্থী, নরপিশাচ ঘাতকরা শুধু মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ আটজন সহযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে থেমে থাকেনি। তারা মেতে উঠেছিল অদম্য রক্ত পিপাসায়।

প্রতিবছর ১০ নভেম্বর আসে জুম্ম জাতির হৃদয়ে শোক আর কষ্টের দীর্ঘশ্বাস হয়ে। প্রতিবছর এই দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা, গভীর শোক আর ভালবাসায় ফুলে ফুলে সিক্ত হয় শহীদ বেদী। এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। এই শোকাবহ দিনে '৮৩ ঘাতক বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালিপ্সু গিরি-প্রকাশ- দেবেন-পলাশ নামক দানবদের ঘৃণাভরে ধিক্কার জানাই। আজকের এই দিনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি অকুতোভয় সকল বীর শহীদদের যাঁরা জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আপোসহীন আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল হয়ে যাঁরা অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে আজ দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করছেন। মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। জীবন-মৃত্যু চিরায়ত সত্য। কিন্তু এমন কিছু মৃত্যু যা অনাকাঙ্খিত। যে মৃত্যু সবাইকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে মৃত্যুকে মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। যেমন মহান নেতা এম এন লারমার মৃত্যু। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যাঁরা মৃত্যুর পরও তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকে। তেমনি একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাদের অবিসংবাদিত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজ এম এন লারমা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু ঘাতকদের সাধ্য ছিল না ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলা। ঘাতকরা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের জয়যাত্রাকে মাঝপথেই ধ্বংস করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়েছে।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস লিখতে হলে, জুম্ম জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের কথা লিখতে হলে মহান নেতা এম এন লারমার কথা অবশ্যই লিখতে হয়। কারণ তিনি ইতিহাসের সাথে মিশে আছেন। অপরদিকে এম এন লারমার খুনীরা আজ অপরাধীর কাড়গড়ায়! তারা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিহাস খুনিদের ক্ষমা করেনি। জুম্ম জাতির ইতিহাসে তাদের নাম বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী, বিভেদপন্থী হিসেবে চিরদিন ঘৃণিত হয়ে থাকবে। জাতীয় সংসদ শোক প্রস্তাবেও মহান নেতা এম এন লারমার হত্যাকারী হিসেবে 'বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ -দেবেন-পলাশ চক্র'দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে পাঠ করা শোক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "এম এন লারমা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার খেদারছড়ার থুম এলাকায় 'বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ- দেবেন-পলাশ চক্র' নামের একটি সশস্ত্র গ্রুপের আক্রমণে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪। স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এবং ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন।"

দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে জুম্ম জনগণ এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন করে আসছে। জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর এ বছর মহান নেতা এম এন লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত হচ্ছে। তাই আজ জুম্ম জাতি গৌরবময় শোকাবহ এক অনন্য ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে। মহান নেতা এম এন লারমা জুম্ম জাতির

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুর আগ অবধি যে লড়াই-সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন, সেই সংগ্রাম ও বিপ্লবী জীবনের মর্যাদাপূর্ণ সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর ৩৩ বছর পর গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিকাল পাঁচটায় জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের শুরুতে স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শোক প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা গৃহীত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যখন অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে তখন দেশের সাম্প্রদায়িক, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী, স্বার্থান্বেষী মহল এটাকে ভুল ব্যাখা দিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। তারা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ইত্যাদি আখ্যায়িত করে অপপ্রচার চালায়। কিন্তু জুম্ম জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বরাবরই বলে আসছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাকে আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করতে হবে।

শোক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র, নম্র, সহানুভূতিশীল, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাদাসিদা জীবনের অধিকারী। ধৈর্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতার দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এক মানুষ। তিনি ছিলেন প্রকৃত এক মানবতাবাদী।" শোক প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, "মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, শিক্ষক এবং নিবেদিত সমাজসেবককে হারালো। এ সংসদ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।" হ্যাঁ, এম এন লারমা শোষিত মানব জীবনের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন একজন মহান বিপ্লবী, মানবতাবাদী। তাঁর বক্তব্যগুলো পাঠ করলেই বুঝা যায়, তিনি কত উদার, মানবিক ও সাম্যবাদী ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং সংসদ সদস্য হিসেবে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজও অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নির্যাতিত-নিষ্পেষিত, শোষিত-বঞ্চিত, গরীব-দুঃখী, মেহনতী মানুষের আলোর দিশারী। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষ মুক্তি পাক- এ ছিল তাঁর আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন।

সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এম এন লারমা বলেছিলেন, "আজ দেশের বাস্তুহারাদের সমস্যা, ভিক্ষুকদের সমস্যা, তারপর কুলি-মজুরদের সমস্যা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন-যাপন করে, সেই কৃষকদের সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে, তার কোন ব্যবস্থা আমরা এই বাজেটে পায়নি। ....বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের, কৃষক-সমাজের যদি উন্নতি না করতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হবে না। বাংলাদেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলে, সেই মাটিকে যদি জীবনের সাথে মিশিয়ে না নিই এবং সোনার ফসল উৎপাদনকারী কৃষককে যদি মূল্য না দিই, তাহলে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে?" তিনি আরো বলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি" এবার বলুন- মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কি শুধু পাহাড়ের জুম্ম জাতির কথা ভাবতেন? না, তিনি বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন দেশের মানুষকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যখন অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে তখন দেশের সাম্প্রদায়িক, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী, স্বার্থান্বেষী মহল এটাকে ভুল ব্যাখা দিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। তারা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ইত্যাদি আখ্যায়িত করে অপপ্রচার চালায়। কিন্তু জুম্ম জনগণের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বরাবরই বলে আসছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাকে আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করতে হবে। তাই দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রারম্ভেই বলা হয়েছে- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্যের কথা। তবুও দেশের কিছু সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ-মৌলবাদী এবং উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল প্রায়শই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে এখনও নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে!

সাবেক সংসদ সদস্য এম এন লারমা তৎসময়েও বলেছিলেন, "বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি? আমরা জানি, ইতিহাস বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবো?" তিনি আরো বলেছিলেন, "গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে

সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না।"

জুম্ম জাতির অস্তিত্ব আজ বিপদাপন্ন। অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? এই রূঢ় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলছি- আর নিরবতা নয়; এবার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পালা। জুম্ম জনগণ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে শিখেছে। জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের সে সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্ত ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর করে জুম্ম জাতির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন। এটা নি:সন্দেহে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র সুসংহত করা ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে জুম্ম জনগণ ও দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিকমনা মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানালেও সরকার কর্ণপাত করছে না।

জুম্ম জাতির অস্তিত্ব আজ বিপদাপন্ন। অস্তিত্বের শেকড়ে টান পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? এই রূঢ় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলছি- আর নিরবতা নয়; এবার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পালা। জুম্ম জনগণ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে শিখেছে। জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের সে সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গেছেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপথ শেষাবধি যে দিকেই ধাবিত হোক না কেন, ছাত্র ও যুব সমাজকেই তার মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

এম এন লারমা সম্পর্কে ছাত্র ও যুব সমাজকে জানতে হবে। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম, নীতি-আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, কর্মজীবন সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। মহান নেতা এম এন লারমা সম্পর্কে জানতে ফেসবুকে অনেকেই প্রশ্ন করেন! অনেক সময় সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না। তাই আমি তাদের লিখেছি- আমিও তো মহান নেতাকে দেখিনি। আমিও তাঁর জীবন-সংগ্রাম, দর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। সেজন্য প্রতিবছর ১০ই নভেম্বরের স্মরণ সভায় বক্তাদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। এম এন লারমার সংগ্রামী সহযোদ্ধা, সহপাঠীদের স্মৃতি চারণমূলক বক্তব্যগুলো শুনি, রেকর্ড থেকে বারবার শুনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথ্য ও প্রচার বিভাগ থেকে প্রতি বছর ১০ই নভেম্বর স্মরণে প্রকাশনা প্রকাশিত হয়। সে প্রকাশনার লেখাগুলো পড়ি। আপনারাও ১০ই নভেম্বরের স্মরণসভায় অংশগ্রহণ করুন। ১০ই নভেম্বর স্মরণে প্রকাশিত প্রকাশনাটি পড়ুন। আজও এই কথাই বলছি। যারা ১০ই নভেম্বর স্মরণে প্রকাশিত প্রকাশনাগুলো পড়তে আগ্রহী বা জুম্ম জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস, মহান নেতা এম এন লারমা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ওয়েবসাইটে (http://www.pcjss-cht.org) দেখতে পারেন।

আর ১০ই নভেম্বর স্মরণে প্রকাশিত প্রকাশনাগুলো পড়তে চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ওয়েবসাইটের (http://www.pcjss-cht.org) Menu–GiPublications অপশনে ক্লিক করলে আপনি ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলো পাবেন। সেখান থেকে ডাউনলোড (পিডিএফ ফাইল) করে নিয়ে আপনি পড়তে পারবেন। এছাড়া এম এন লারমা সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন-এর ব্লগ (https://mnlarmafoundationblog.wordpress.com) এছাড়া বইয়ের মধ্যে রয়েছে- মঙ্গল কুমার চাকমার সম্পাদনায় ও এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম। ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন 'তারুণ্যের চোখে এম এন লারমা' নামক তরুণদের লেখা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছে।

এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ও এম এন লারমা স্মৃতি গণপাঠাগার কয়েক বছর ধরে এম এন লারমার জন্মদিবস পালন করে আসছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মহান নেতা এম এন লারমার ৭৭তম জন্মদিবস পালিত হয়েছে। এতে স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে করে নতুন প্রজন্ম পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাচ্ছে। এধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আলোচকদের বক্তব্যগুলো শুনলেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। নতুন প্রজন্মের মাঝে এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রাম, নীতি-আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক।

মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়। তিনি ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়াবার পথ দেখিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন। আজ জুম্ম জাতির বিপ্লবী মহান নেতা এম এন লারমার রক্ত, শহীদদের রক্ত, শুধু শোকের নয়; শপথেরও। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শই হোক আমাদের পথ আর পাথেয়। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই এই মহান বিপ্লবীকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের মাধ্যমে এর সমাধান

মঙ্গল কুমার চাকমা

এক. পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল (১৩,৩১৮ বর্গকিলোমিটার)। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন সমগ্র বাংলাদেশের এক-দশমাংশ কিন্তু নিবিড় চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। ১৯৬৪-৬৬ সনে কানাডার ফরেস্টাল ফরেস্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড এর ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষযোগ্য ধান্য জমির ('এ' শ্রেণিভুক্ত) পরিমাণ পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জমির মাত্র ৩.০৭% অর্থাৎ ৭৬,৪৬৬ একর। এছাড়া 'বি' শ্রেণিভুক্ত ঢালু জমিগুলো রয়েছে মোট জমির ২.৭২% অর্থাৎ ৬৭,৮৭১ একরযেগুলো সোপান কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। আর 'সি' শ্রেণিভুক্ত জমি রয়েছে পার্বত্যাঞ্চলের মোট জমির ১৪.৭১% (৩,৬৬,৬২২ একর) যেগুলো মূলত উদ্যান চাষের জন্য ব্যবহার করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশী রয়েছে 'ডি' শ্রেণিভুক্ত জমি যা পার্বত্যাঞ্চলের মোট জমির ৭২.৯১% অর্থাৎ ১৮,১৬,৯৯৩ একর। 'ডি' শ্রেণিভুক্ত জমিগুলো কেবল বন ও বনায়নের জন্য উপযোগী। আরো রয়েছে সি-ডি শ্রেণিভুক্ত ৩২,০২৪ একর (১.২৮%) জমি। এছাড়া ৬৫৩ একর বসতভিটা (০.০৩%) এবং ১,৩১,৬৩৭ একর জলাশয় ভূমি (৫.২৮%) রয়েছে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির পরিমাণ ২৪,৯২,২৬৬ একর। তবে মনে রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জমি দেশের সমতল জমির মতো উর্বর ও বহু ফসলী নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'টি প্রধান ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে রিজার্ভ ফরেস্টের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে বাদবাকি এলাকার জন্য। রিজার্ভ ফরেস্ট যা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট অঞ্চলের এক-চুতর্থাংশের সামান্য কম তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়াধীন বন বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাদবাকি এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সংমিশ্রণে ব্যবস্থাপনার দ্বারা, যার মধ্যে রয়েছে রাজা, হেডম্যান এবং কার্বারীর মতো প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, জেলা পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। তবে ভূমি ব্যবস্থাপনা এখনো জেলা প্রশাসনও যুক্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অঞ্চল পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয় হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকরা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন।

দুই. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এমনিতেই অত্যন্ত কম। অধিকন্তু ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণি আবাদী জমির ৪০ শতাংশ (৫৪ হাজার একর জমি) এই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। আবাদী জমির স্বল্পতার কারণে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে শত শত ভূমিহীন পরিবার। কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে এই প্রতারণামূলক প্রচারণা চালিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে দেশের সমতল জেলাগুলো হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে চার লক্ষাধিক বহিরাগত লোক এবং তাদেরকে বসতি দেয়া হয় জুম্মদের ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় জমির উপর। নানা ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার মাধ্যমে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জমিগুলো বেদখল করে নেয়া হয় প্রচলিত আইন ও প্রথা লঙ্ঘন করে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড।

রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি, জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমি দীর্ঘমেয়াদী লীজ দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিংবা অধিগ্রহণের উদ্যেগে নেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় এ ধরনের সামরিক উদ্দেশ্যে ৭১,৮৭৭.৪৫ একর অধিগ্রহণ বা বেদখল করা হয়েছে। অধিকন্তু রিজার্ভ ফরেস্ট ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ১৯৯০ থেকে ৩১ মে ১৯৯৮ তারিখের জারিকৃত বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২,১৮,০০০ (দুই লক্ষ আটার হাজার) একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে শত শত একর জায়গা-জমি অধিগ্রহণ ও জবরদখল করা হচ্ছে। এছাড়া জুম্মদের আইনের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, জালিয়াতির মাধ্যমে, দাদনের ফাঁদে ফেলে, সামরিক ও ভূমি প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে, বান্দরবানে কথিত 'আর' কবুলিয়তের মাধ্যমে ইত্যাদি নানা অসৎ উপায়ে জুম্মদের জায়গা-জমি হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

তিন. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই মৌলিক সমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সমাধানের লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করার বিধান করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৪নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, "জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।" চুক্তির ৫নং ধারায় সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তাঁর প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁর প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ করে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে। ভূমি কমিশন "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুয়ায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন" বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

চার. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৯৯৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন গঠিত হয়। এই ধারা অনুযায়ী এ যাবৎ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে-

(১) ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন।

(২) ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে।

(৩) বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনিও ২০০৭ সালের নভেম্বরে মারা যান। এরপর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেনি।

(৪) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯ জুলাই ২০০৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৮ জুলাই ২০১২ তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দুই বছরের অধিক কমিশনের চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে।

(৫) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকার কর্তৃক গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিগত ১৭ বছরে পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন না হওয়ার কারণে কমিশনের কাজ এতদিন শুরু করা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে তড়িঘড়ি করে ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পাশ করেছিল। ফলে উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও নাগরিক সমাজ ভূমি কমিশন আইনের এই বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনের জন্য একদিকে সভা-সমিতির মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে, অন্যদিকে সরকারের সাথে একের পর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক অনেক বৈঠকের পর ২০১১ এবং ২০১৫ সালে দুইবার সরকার ও আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদনুসারে উক্ত ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া এক রহস্যজনকভাবে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে থাকে।

অবশেষে গত ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯ আগস্ট "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০১৬" জারী করা হয়েছে এবং গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিল (সংশোধন) ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে আইনটি সংশোধন সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

পাঁচ. ভূমি কমিশনের কার্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ (২০১৬ সংশোধিত) এর ৬ ধারায় ভূমি কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে–

"(১) কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা;

(খ) আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল;

(গ) পাবর্ত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূতভাবে জলেভাসা ভূমিসহ (ঋৎরহমব খধহফ) কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত বা বেদখলজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল:

তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং বসতবাড়ীসহ জলেভাসা জমি, টিলা ও পাহাড় ব্যতীত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা ও বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত থাকিবে।

(৩) উক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন যে কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কমিশন বা চেয়ারম্যান বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন সদস্য যে কোন বিরোধীয় ভূমি সরজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ৭ ধারার (৪) উপধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে বৈঠকের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।"

উক্ত ৭ ধারার (৫) উপধারায় বর্ণিত রয়েছে যে, "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬ (১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

আইনের ১৬ ধারায় 'কমিশনের সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি এবং চূড়ান্ততা' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "কোন বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের উপর কমিশন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল বা রিভিশন দায়ের বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"

আইনের ১৭(১) ধারায় 'কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত, আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে।"

ছয়. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি

এ অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনাও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা। বিশেষত: ব্রিটিশ শাসনামল হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে এসেছে বিশেষ আইনের আওতায়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন কাঠামো এবং আলাদা ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপিত হয়েছে। এ শাসনব্যবস্থায় জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী অর্পণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ তা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং সরকার পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা সম্পাদন করতে পারে।

পার্বত্যাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা বরাবরই দেশের অপরাপর সমতল অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা হতে পৃথক। অনুরূপভাবে এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনাও সমতল জেলাগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলত: তিন ধরনের ভূমি রয়েছে। প্রথমত: বন্দোবস্তকৃত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি যা বেশীর ভাগই ধান্য জমি। দ্বিতীয়ত: ভোগদখলীয় জমি যা বেশীর ভাগই বাস্তুভিটা, বাগানবাগিচা ইত্যাদির ভূমি। তৃতীয়ত: রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় কোনটাই নয় এমন ভূমি যা জুমভূমি নামে খ্যাত ও প্রথাগতভাবে সংশ্লিষ্ট মৌজা অধিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানাধীন। অর্থাৎ মৌজা এলাকায় অবস্থিত ভূমির মধ্যে ব্যক্তি নামে বন্দোবস্তকৃত বা ভোগদখলীয় ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমিই মৌজাবাসীর। রাজা-হেডম্যান-কার্বারী নিয়ে গঠিত প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই মৌজার

তাই মৌজার অধিবাসী যে কোন ব্যক্তি হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে মৌজাস্থিত সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমিতে জুম চাষ, গো-চারণ, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার্য বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদির অধিকার রয়েছে। এজন্য জুমচাষীরা পরিবার ভিত্তিক জুম খাজনাও দিয়ে থাকে। জুমভূমি সমষ্টিগত মালিকানাধীন বিধায় জুম খাজনা জমি ভিত্তিক না হয়ে, মূলতঃ মাথাপিছু ভিত্তিক ক্যাপিটাশন ট্যাক্স হিসেবে ধার্য হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪১ ও ৪২ নং বিধিতে জুমচাষ সম্পর্কে এবং ৪৩ নং বিধিতে সার্কেল চীফ ও মৌজার হেডম্যানের জমির খাজনা আদায় ও মওকুফের বিধান বিবৃত হয়েছে। এসব বিধি বলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীনে বন্দোবস্তকৃত বা অধিগ্রহণকৃত ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমির উপর মৌজার অধিবাসীদের ঐতিহ্যগত মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকে। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ভূমি ব্যক্তি মালিকানাধীনে বন্দোবস্তকৃত না হয়ে থাকলেও মৌজায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক দখল বা চাষাবাদ করা হয়ে থাকলে তাকে দখলকার বা চাষাবাদকারী হিসাবে প্রচলিত রীতিতে উক্ত ভূমির মালিক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কোনো মৌজার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট হেডম্যানের পরামর্শ নেওয়ার বিধানটি উক্ত মৌজার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জনগণের অধিকারেরই স্বীকৃতি। প্রত্যন্ত এলাকায় অধিবাসী, বিশেষ করে মৌজার হেডম্যান এবং কার্বারীর নেতৃত্বে এ ধরনের প্রথা ও রীতি চর্চা করে আসছে। এসব প্রথা বা রীতি অলিখিত বা মৌখিকভাবে জাতিগোষ্ঠী ভেদে ভিন্ন নিয়মে প্রচলিত হয়ে আসছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথাগত আইনগুলো লিখিত আইন বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে অথবা লিখিত আইনে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ২ ধারার (ছ) দফায় বলা হয়েছে যে, "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে।" ভূমি সংক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইনগুলো হচ্ছে–

- পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১নং আইন)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮
- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধনীসহ)
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধনীসহ)
- বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধনীসহ)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বন্দোবস্তী, হস্তান্তর ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এই পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন ও প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ এর ৩৪ ধারা অনুসারে সার্কেলের আওতাধীন ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মৌজা প্রধানের সুপারিশ ও মতামত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন ও রীতি মোতাবেক মৌজা প্রধানের সুপারিশ ও মতামত ব্যতীত মৌজাধীন কোন জায়গা জমি বন্দোবস্ত (হস্তান্তর) হতে পারে না।

সাত. আবেদনপত্র দাখিলের পদ্ধতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ৯ ধারায় কমিশনের কাছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী তাঁর দস্তখত বা টিপসইযুক্ত দরখাস্ত সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় লিখে কমিশনের কাছে দাখিল করবেন। আইনে আরো বলা হয়েছে যে, কমিশন কর্তৃক উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময় ন্যায় বিচারের স্বার্থে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, আবেদনকারী তাঁর আবেদন সংশোধন করতে পারবেন।

ভূমি কমিশন আইনের ১০(১)(২) ধারায় আবেদনের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারীর জানামতে দাবীকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার-এর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। উক্ত আবেদনের প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখিত সকল ব্যক্তির উপর কমিশন নোটিশ জারী করবে এবং নোটিশের সাথে আবেদনপত্রের একটি কপিও সংযুক্ত করবে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের বরাবরে আবেদনপত্র লেখতে হবে। এরপর বিষয় উল্লেখ পূর্বক আবেদনকারী বা বাদীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। তার নীচে প্রতিপক্ষ এর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং ক্ষেত্রমতে জমি দখলদারের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা আবশ্যক। এরপর কিভাবে জমি বেদখল হয়েছে, বেদখলের ক্ষেত্রে কে বা কারা জড়িত ছিলেন, কখন বা কোন সময়ে বেদখল করা হয়েছে, ভূমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি, কোন প্রকার বা শ্রেণির ভূমি, সংশ্লিষ্ট ভূমির খতিয়ান নম্বর, হোল্ডিং ও দাগ নম্বর (যদি থাকে) ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক প্রতিকার চেয়ে বা ভূমি ফেরত পাওয়ার আর্জি জানিয়ে আবেদনপত্র সমাপ্ত করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় সহায়ক দলিলাদি (যদি থাকে) যেমন- জমাবন্দী বা বন্দোবস্তীর কবলা, খাজনা দাখিলা, ডকেট নম্বর সম্বলিত দলিল (আবেদন) ইত্যাদি সংযুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

আইনের ১০(৩) ধারায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন ব্যক্তিও সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখ পূর্বক প্রতিপক্ষ হওয়ার আবেদন করতে পারবেন এবং কমিশন উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষভুক্ত করতে পারবে।

ভূমি কমিশন আইনের ১১ ধারায় কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের কোন কার্যক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে কমিশন যেইরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ ও

লিপিবদ্ধ করতে পারবে। কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করলে কমিশন একজন অনুবাদকের সহায়তা গ্রহণ করতে এবং অনুবাদকের অনুবাদ অনুসারে উক্ত সাক্ষ্য বাংলায় লিপিবদ্ধ করবে। আরো বলা হয়েছে যে, কমিশন লিখিত নোটিশ দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান এবং সকল প্রকার তথ্য ও দলিল-পত্রাদি দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবে। কমিশন কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্য হুবহু লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়, বরং উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করলেই চলবে বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে।

আট. সেটেলার বাঙালিদের বিরোধিতা ও অপপ্রচার

মন্ত্রীসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ অনুমোদনের পর পার্বত্য নাগরিক পরিষদ, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য গণপরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম-অধিকার আন্দোলন ও পার্বত্য বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ নামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পরিচালিত পাঁচটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন উক্ত আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় তিন পার্বত্য জেলা ও ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এবং সর্বশেষ গত ১০-১১ আগস্ট দুইদিন ব্যাপী তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভূমি কমিশনের বৈঠকের বিরুদ্ধে এবং সর্বশেষ ১৩ অক্টোবর তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল আহ্বান করে। তারা আরো কঠোর কর্মসূচির ঘোষণার হুমকি দিয়ে চলেছে।

সেটেলার বাঙালিদের উক্ত পাঁচ সংগঠনের বক্তব্য হচ্ছে, "নতুন এ আইনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন এবং ভূমির অধিকার হারাবেন। ...আগে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। কমিশনের নয় সদস্যের মধ্যে দু'জন থাকতো বাঙালি। কিন্তু এখন আইনে সংশোধনীর ফলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে আর কোনও বিষয় চূড়ান্ত হবে না। চেয়ারম্যানসহ অন্তত তিন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে কোরামের জন্য। আর এতে পাহাড়িদের আধিক্য থাকবে ও নিজেদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন' (বিবিসি ১০ আগস্ট; পার্বত্যনিউজ ১১ আগস্ট)। আর সে কারণে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী বাতিলের দাবি জানাচ্ছে এই পাঁচটি সেটেলার বাঙালি সংগঠন।

বস্তুত ভূমি কমিশন আইনের উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনে জুম্মদের সদস্য সংখ্যা যেমনি বৃদ্ধি করা হয়নি, তেমনি বাঙালিদের সদস্য সংখ্যাও কমানো হয়নি। কমিশনের চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা কমিয়ে ও কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অপর দুইজন সদস্যের পরিবর্তে অপর তিনজন করার ফলে অন্য কোন সদস্যের ক্ষমতাও বাড়ানো হয়নি। বরঞ্চ অধিকতর গণতান্ত্রিক ধারা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে পাহাড়িদের আধিক্য থাকবে ও বাঙালিদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে' কিংবা 'পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন এবং ভূমির অধিকার হারাবেন' এমন আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক ও অবান্তর।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পাহাড়ি-বাঙালি যাদের জায়গা-জমি বন্দোবস্ত ও ভোগদখল রয়েছে তাদের অন্যায্যভাবে উচ্ছেদ হওয়ার বা ভূমি অধিকার হারাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতিকে লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে, জবরদস্তি উপায়ে কিংবা পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে জায়গা-জমি বন্দোবস্তী নিয়েছেন বা বেদখল করেছেন তাদের তো আইনের আওতায় আসতেই হবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে তো অবৈধ বন্দোবস্তী বা বেদখল ছেড়েই দিতে হবে। সেইসব অবৈধ দখলদারদের পক্ষে সাফাই গাওয়া কখনোই মানবিক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক হতে পারে না। বলাবাহুল্য, বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও ভূমি অধিকার হারাবার সস্তা শ্লোগান তুলে ধরে সাধারণ বাঙালিদের তথা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে সেভাবে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও চুক্তির বিরুদ্ধে সেইরূপ অপপ্রচার চালিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

নয়. ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনের নীরবতা

পার্বত্য ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে নিঃসন্দেহে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই আইন সংশোধনকে কেন্দ্র করে তথা এই আইনের সংশোধনীর বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তবাদী মহল যে অপপ্রচার, হরতাল ও হুমকি-ধামকি দিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও প্রশাসন একেবারেই নিরব ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও উগ্র জাতীয়তবাদী শক্তির অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে তারা একেবারেই দেখেও না দেখার ভান করে চলেছে।

অথচ যখন গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬, সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম থেকে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার দুদুকছড়া পর্যন্ত ৩০০ শতাধিক কিলোমিটার সড়ক এবং তিন পার্বত্য জেলার জেলা ও উপজেলা সদরে আয়োজিত মানববন্ধনে প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বের একটা অংশ বাধা সৃষ্টি করে। মানববন্ধনের অনুমতি চেয়ে ১৫ দিন পূর্বে আবেদনপত্র জমা দেয়া হলেও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে "মানববন্ধনের অনুমতি দেয়া হবে না" বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটিকে জানানো হয়। খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন

এলাকায় সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক মানববন্ধনের চেষ্টা করা হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ দিয়ে হামলা করা হয়। ব্যানার ও ফেস্টুন কেড়ে নেয়া হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বের একটা অংশ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় উক্ত মানববন্ধনে অংশগ্রহণ না করার জন্য জনগণকে হুমকি প্রদান করা হয় বলে জানা গেছে।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে যৌক্তিক কারণে পার্বত্যবাসী ও দেশের নাগরিক একাট্টা হয়ে বিরোধিতা করতে থাকে, সেই জনমতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দীপঙ্কর-বীর বাহাদুর-ক্যশৈহ্লা-কুজেন্দ্র নেতৃত্বাধীন তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও প্রশাসন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠে। ২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি সেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে হামলার জন্য দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ তাদের লালিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়েছিল। অধিকন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নির্বাচিত পরিষদ গঠন না করে এবং ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত চেয়ারম্যান-সদস্যদের দ্বারা অন্তর্বর্তী পরিষদের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার হীনউদ্দেশ্যে যখন সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে অন্তর্বর্তী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ১৫-তে বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিল তখন তার বিরুদ্ধে পার্বত্যবাসী ও দেশের নাগরিক সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ও জনমতের বিপরীতে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব আন্দোলনকারী জনতার বিরুদ্ধে হুমকি-ধামকি ও রাজনৈতিক প্রতিরোধে তৎপর ছিলেন। এছাড়া সংশোধিত ভূমি কমিশন আইন ২০১৬-এর বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর চলমান পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগ এখনো নিরব রয়েছে। বলাবাহুল্য, স্থানীয় আওয়ামীলীগসহ জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অনেক ব্যক্তিবর্গ ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনীর বিরোধিতাকারী পাঁচ সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর সাথে নানা কায়দায় সম্পৃক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কবিতা

৮৩ ফিরি এজে*
নিতীষ চাকমা

হুওই ভিজে-
মাদি। য়েইল হেরর মাদায় মাদায়
পহ্ন পহ্ন পানি জু-আয়।
ঘুমুরো ডোগোচ্ছে জুরো আহ্ভায়
কাদি মাস্যে জার, দিজে মাক্কে লামি যায়।
একলাগারে ধুজেগি,
মুজ্জো যেয়ে হাল; লো ঝোড়েয়ে হুও পানিদি।

৮৩ ফিরি এজে,
কুজি রান্যের উভো মরা গাজে গাজে।
এগালা কর, এগেরে কানানার র-লোই।
চিদ নভিচ্ছে বেল দিবোরর চিকচিক্কেলই।
পাগানা বিগুন, কুমুরোর তুমবাজে
ভঙরার নাজে নাজে,
চিদোত ফাগুনো আহ্ভা বাজিবার কধা।
ঝামমাজ্জে কানর ইয়েং ইয়েং কাদিবার কধা।
তো কী চিদ ন-জুরায়?
তিরেশির পুড়ি যেয়ে ঘা, এয দ ন-শুগায়।
এগলাগারে ধুজেগি,
পোড়ান্যে-শুলান্যে। কিজেগ কারি কারি ডাগি।

৮৩ ফিরি এজে,
এক পল্লা নয়, ঘুজি ঘুজি এজে।
চোগোপানি পুজি দিবাত্তে।
লাড়েইয়োর বল তুলি দিবাত্তে।
আগুন লুড়ো জ্বালেই দিবাত্তে।
লো-গুল্যে রাঙোচ্ছে ছিলুম্মোই।
ছনমুজ্জে কিয়েত জার'কাদা তুলি দিবাল্লাই।

*'৮৩ ফিরি এজে' (এর বাংলা '৮৩ ফিরে আসে') শীর্ষক একটি চাকমা ভাষার কবিতা। কবিতাটিতে ১৯৮৩ সালে শহীদ মহান বিপ্লবী এম এন লারমা ও তাঁর আট সহযোদ্ধার মৃত্যুবার্ষিকী'র বার বার ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। এই স্মৃতিটি বার বার ফিরে এসে অশ্রুজল মুছে দিয়ে লড়াইয়ের শক্তি যোগায়, অগ্নিমশাল প্রজ্জ্বলিত করে দিয়ে যায়, আর অচেতন শরীরে চেতনার শিহরণ সঞ্চার করে যায়।

ভুলি নাই ভুলবো না তোমাকে
জড়িতা চাকমা

শারদ-প্রভাতে আজি, পাতায় পাতায়, শুভ্র নিশির-শিশির,
পাখীর কলতানে মূখরিত কাননে, ফুটেছে নানা ফুল রাশি,
পূর্ব দিগন্তে এ প্রভাতে, রঙিন সূর্যোদয় তখনো হয়নি।
দশ নভেম্বরে, এই কালো দিন, তেত্রিশটি বছর আগে,
শোনার এই শোক সংবাদ, জুম্ম জাতি ছিল অপ্রস্তুত ;
কালোরাত, ঘুমন্ত মানুষ, বনের পশু-পক্ষী তখনো জাগেনি।

নিপীড়িত-বঞ্চিত, উপেক্ষিত জুম্ম জাতি, শুনে তব বাণী,
জেগেছে তারা, হয়েছে প্রতিবাদী, হয়েছে বীর সংগ্রামী,
হয়ে আগোয়ান সবে এক পথে, স্বাধিকারের তরে।
সত্তর আর তেহাত্তরে হয়েছো তুমি, পার্বত্য জন-প্রতিনিধি,
হয়েছো আগুয়ান, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ধ্বজা ধরে
পঁচাত্তরে চলে গেলে তুমি, তব স্বপ্নের জুম-পাহাড়ে।

সংসদ-ভবন ছেড়ে, নিজ হাতে যবে, তুলে নিলে হাতিয়ার,
সাথে ছিল তব, প্রিয় ছাত্র-যুবসমাজ, লাখো জুম্ম-জনতা,
অবিরাম যেথায় ঝড়েছিল রক্ত, চব্বিশটি বছর ধরে।
দশ নভেম্বরের এক্ষণে রয়েছি, আজো মোরা সংগ্রামে সবাই,
তোমারি চলার পথ ধরে, প্রতিষ্ঠায় আদিবাসী জুম্মাধিকার;
চিরকাল পালিব এই শোকদিবস, ধরিব তব ধ্বজা উন্নত শিরে।

অকৃত্রিম দেশপ্রেমের শিক্ষা তোমার, থাকিবে চিরস্মরণীয়,
প্রতিদিন উঠিবে রবি, যাবে অস্তাচলে, রবে তুমি চিরোজ্জ্বল,
দিবাশেষে নামিবে আঁধার, আবারো হবে নতুন সূর্যোদয়।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুহূরী, চেঙ্গী আর
ম্যাইনী, কাচলঙ, ধলেশ্বরী নদী, রবে বহমান, চিরকাল ধরে,
এগুবে জুম্ম জাতি, পোড় খেয়ে খেয়ে, হবে জয় সুনিশ্চয়।

অসীম ত্যাগ, আর কঠিন সাধনায়, কেটেছে সারাটি জীবন তোমার,
হয়ে দেশপ্রেমিক, গেয়েছো মুক্তির গান, করেছো মুক্তি-পাগল যাদের,
আছি মোরা আজো সেই পথে, বাজিছে যেখানে তোমার বাঁশীর সুর।
প্রতি দশ নভেম্বর, ৮৩ স্মরণে, দৃষ্টি যায় যখন ছবিতে,
মোরা খুঁজে পাই, দীপ্ত চক্ষু আর স্মিত হাসি তোমারি ছবির মাঝে;
রয়েছো তুমি সবার, মনের মন্দিরে সদা, নহো তুমি বহুদূর।

সবুজ ঘেরা পাহাড় দেশে, সাদা-মনের মানুষ যেথায়, জুম্ম তোমার প্রাণ,
প্রতি বছর যবে আসিবে শোক দিন, তোমার ছবি, দেখিব নবচেতনা দিয়ে,
সদা জাগ্রত আদিবাসী জুম্ম, গাইবে তোমার প্রিয় গান, এই জুম-পাহাড়ে।
এমন দেশটি, ...কোথাও .....খুঁজে পাবে .....নাকো তুমি,
ওযে..... সকল দেশের সেরা সে যে, আমার..... জন্মভূমি,
ভুলি নাই মোরা, ভুলবো না কোনদিন, জানাই লাখো লাল সালাম তোমারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের নিপীড়ন-নির্যাতন

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় শাখাসংগঠন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীর উপর নিপীড়ন-নির্যাতন সীমাহীন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সেনা-বিজিবি-পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেফতার, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাসী ও তছনছ, জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৩০ জনকে গ্রেফতার, ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি, ৮৯ জনকে মারধর এবং জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। নিম্নে সেনা-বিজিবি-পুলিশ, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় শাখাসংগঠন ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক নিপীড়ন-নির্যাতনের হিসাব দেয়া গেল-

- ১৩০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের
- ৩০ জনকে গ্রেফতার
- ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি
- ৩১ জনকে সেনা-বিজিবি কর্তৃক নির্যাতন
- ৫৮ জনকে সেটেলার কর্তৃক হামলা
- ১৫০-এর অধিক জনকে এলাকাছাড়া
- ৫ জনকে খুন
- ৩টি অফিসসহ ২৪টি বাড়িতে সেনা তল্লাসী
- ৩২টি বাড়ি ভাঙচুর ও তছনছ
- ২৪ জন বিজিবি-সেটেলারের ভূমিগ্রাসের শিকার
- ১৯ জুম্ম নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার

সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বের এসব হীন তৎপরতার পেছনে মূল লক্ষ্য হলো-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে বিপর্যস্ত করে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা;
- জুম্ম জনগণের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা;
- বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে জনসংহতি সমিতির সমর্থনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা ও তাদের স্ব স্ব পদ থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করা।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকার এখনো চরম উদ্যোগহীনতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে চলেছে। পক্ষান্তরে নানা উন্নয়নের নামে জুম্মদের ভূমি বেদখল ও ভূমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র, জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমের নামে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম বিরোধী অপপ্রচার জোরদার, ভূমি কমিশনের বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর জঙ্গী তৎপরতা, জুম্ম নারীর উপর ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলছে। নিম্নে এর কিছু ঘটনা বর্ণনা করা গেল–

১. সেনা-বিজিবি-পুলিশী নির্যাতন

গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পূর্ব থেকে জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থকসহ সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে সেনা-বিজিবি-পুলিশী অভিযান ও ধরপাকড়, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও হয়রানি, সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য স্থানীয় ক্যাম্পের সেনা-বিজিবি কর্তৃক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ এবং জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীসহ অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উপর নানা কায়দায় চাপ সৃষ্টি করা, সেনা-বিজিবি-পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর, জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গী সংগঠনগুলোকে লেলিয়ে দেয়া, জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করা, ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা, অপপ্রচার ইত্যাদি জোরদার হয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সেনা-বিজিবি-পুলিশী অভিযানে বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের একজন সদস্যসহ ৩০ জন জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ও নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেনা-বিজিবি ও সেটেলার কর্তৃক ৮৯ জনকে মারধর করা হয়েছে, ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি করা হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতির তিনটি অফিসসহ ২৩টি ঘরবাড়ি তল্লাসী ও তছনছ করা হয়েছে।

ইউপি নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীসহ অপরাপর স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে তিন পার্বত্য জেলায় সেনা-বিজিবি তল্লাসী অভিযান জোরদার করে। তার মধ্যে ১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ির নোয়াপতং ইউনিয়নের কানাইজো পাড়ায় অভিযান চালিয়ে মেম্বার পদপ্রার্থী দুইজনকে মারধর ও ৫ জন সমর্থককে ভয়ভীতি প্রদর্শন; ১৫ মে ২০১৬ রাতে জুরাছড়ি উপজেলার ফকিরাছড়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যান এবং মৈদুং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী সাধনানন্দ চাকমার বাড়ি ঘেরাও; ৪ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাঙ্গামাটি জেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দখল করে স্থানীয় আওয়ামীলীগের ভোট ডাকাতিতে ২৫ বিজিবির প্রত্যক্ষ সহায়তা করা; ১৮ মে ২০১৬ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে গেলে জনসংহতি সমিতির সদস্য চন্দ্রলাল চাকমাকে আটক করা ইত্যাদি ঘটনা হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেনা-বিজিবি-পুলিশের উক্ত অভিযানের অংশ হিসেবে গত ১ আগস্ট ২০১৬ দিবাগত রাতে দীঘলছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলায় দীঘলছড়ি ও বাজার এলাকায় এক তল্লাসী অভিযান চালায়। গত ২৬ জুলাই ২০১৬ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের নামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন কুহালং ইউনিয়নের আমতলী, খৈয়াতলী পাড়া ও কোলাক্ষ্যং পাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিরীহ চার জুম্ম গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়িনের বেতছড়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য তারাছা ইউনিয়নের নোয়াপতং মুখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে গ্রামের কার্বারীসহ তিনজনকে মারধর করে। গত ২৬ ও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বান্দরবান জেলা সদরস্থ মধ্যম পাড়ায় জনসংহতি সমিতির সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমার বাড়ি দুইবার ঘেরাও করা হয়।

৩১ আগস্ট ২০১৬ বান্দরবান সেনা জোনের (১৯ বীর বেঙ্গল) কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল হায়দারের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা ও বান্দরবান সদর উপজেলার তিনটি জুম্ম গ্রামে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে ৯টি জুম্ম বাড়িতে তল্লাশী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে এবং তালা ভেঙে জনসংহতি সমিতির কার্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ করে কাগজপত্র তছনছ করে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ একদল সেনাসদস্য কর্তৃক জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে তালা ভেঙে প্রবেশ করে কার্যালয়ের আলমিরা ভেঙে ফাইলপত্র, সভার কার্যবিবরণী বহি, সমিতির মুখপত্র 'জুম্মবার্তা' নিয়ে যায় এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পুলিশসহ বান্দরবান সেনা জোনের একদল সেনা জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখা কার্যালয়ে এক তল্লাশী অভিযান চালায়। এসময় তারা সমিতির কার্যালয়ের আলমিরা ও আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে এবং কার্যালয়ের বিভিন্ন দলিলপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে। সেনা সদস্যরা ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিপিইউ, ইন্টারনেটের মডেম, কার্যালয়ের ফাইলপত্র, একটি ক্যামেরা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। একই সময়ে সেনা সদস্যরা লামা উপজেলায় জনসংহতি সমিতির লামা উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসামের বাড়িতেও তল্লাশী চালায়। সেখান থেকেও জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন দাপ্তরিক কাগজপত্র ও বইপত্র নিয়ে যায়। অবশ্য চাপের মুখে সেনা সদস্যরা পরে এসব দলিলপত্রাদি ফেরত প্রদান করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ৬টি সেনানিবাস ব্যতীত সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও বিগত ১৯ বছরে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৬৬টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব জারী করে সেনাবাহিনীকে অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে যত্রতত্র তল্লাসী অভিযান পরিচালনা, মারধর ও ধরপাকড়, সাধারণ প্রশাসনসহ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ এবং বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ, পর্যটন ব্যবসা পরিচালনা ও পর্যটনের নামে ভূমি জবরদখল ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী বরাবরই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

হয়রানির উদ্দেশ্যে সেনা-বিজিবি-পুলিশ-প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের মদদে জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সাজানো মামলা

ক্র:	মামলা তারিখ ও থানা	বাদী	বিবাদী	হয়রানিমূলক অভিযোগ	গ্রেফতার*
১.	০৫/০৪/২০১৬ রুমা থানা	রুমা ইউএনও	২৫ জন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে	বগালেইকের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনে বাধা দান	৪ জন
২.	২৯/০৫/২০১৬ বিলাইছড়ি থানা	আয়না চাকমা	৭ জনের বিরুদ্ধে	আয়না চাকমাকে যৌন হয়রানি ও মারধর	১ জন
৩.	৩১/০৫/২০১৬ বান্দরবান সদর থানা	প্রফুল্ল চাকমা	৪ জনের বিরুদ্ধে	যুব সমিতির সদস্য সুনীল চাকমাকে হত্যা	১ জন
৪.	১৪/০৬/২০১৬ বান্দরবান সদর থানা	হ্লামংচিং মারমা	৩৮ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে	আওয়ামীলীগ নেতা মংপু মারমাকে অপহরণ	১২ জন
৫.	০৪/০৭/২০১৬ বাঘাইছড়ি থানা	নমিসা চাকমা	৯ জনের বিরুদ্ধে	সার্জেন্ট মুকুল কান্তি চাকমাকে অপহরণ	৪ জন
৬.	০১/০৮/২০১৬ বান্দরবান সদর থানা	মো: আবদুল করিম	১১ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে	চাঁদাবাজি	১ জন
৭.	১৮/০৮/২০১৬ বান্দরবান সদর থানা	মংসানু মারমা	১৬ জনের নামসহ ৩০/৪০ জনের বিরুদ্ধে	জায়গা দখল ও চাঁদাবাজি	১ জন (দু'টি মামলায়)
৮.	২৩/০৮/২০১৬ বান্দরবান সদর থানা	মো: মহিউদ্দিন	১৬ জনের নামসহ ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে	যানবাহন ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, মারধর	

গ্রেফতার*: উল্লেখিত মামলায় গ্রেফতারকৃত ২৪ জনসহ ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতায় সেনা-বিজিবি-পুলিশের অভিযানে অন্তত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্তত ৬০ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি করা হয়েছে।

২. ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ষড়যন্ত্র

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ এর তফসিল ঘোষণার পর থেকে সেনা-বিজিবি-পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিক হয়রানি চালিয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করা ও ইউপি নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অজুহাত তুলে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। 'সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে' আওয়ামীলীগের অনেক প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ইউনিয়নে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি মর্মে ষড়যন্ত্রমূলক ও ভিত্তিহীন অজুহাত তুলে ধরে সেনা-বিজিবি-পুলিশের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর হয়রানিমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। অপরদিকে ইউপি নির্বাচনে অধিকাংশ ইউনিয়নে প্রশাসনের সহযোগিতায় তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নকল ব্যালট পেপার ও ব্যাপক ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে আওয়ামীলীগ তাদের দলীয় প্রার্থীদেরকে অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করে।

নির্বাচন-উত্তর সময়ে আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের দমন-পীড়ন ও হয়রানিমূলক হীনতৎপরতা আরো জোরদার হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কোন ঘটনা ঘটলেই তাতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে। জনসভা, সংবাদ সম্মেলন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতিকে নিশ্চিহ্নকরণ ও সমিতির সদস্যদের জীবনহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে থাকে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ এর তফসিল ঘোষণার পর থেকে আজ অবধি আওয়ামীলীগের প্রত্যক্ষ মদদে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দুইজন সদস্য, উপজেলা পরিষদের দুই চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য এবং একজন মৌজা হেডম্যান সহ ১৩০ জন জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্য-সমর্থক ও নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, তিনজন সদস্যকে খুন এবং অন্তত দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা দায়ের করার পেছনে মূল লক্ষ্যই হলো এলাকাগুলোতে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী শূন্য করা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা ও চূড়ান্তভাবে তাদেরকে তাদের স্ব স্ব পদ থেকে অপসারণ করা। তারই অংশ হিসেবে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ আলিকদম সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে. কর্ণেল সারোয়ার হোসেন স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মীদের মাধ্যমে আলিকদমের গ্রামে গ্রামে গ্রামের মুরুব্বীদের নিকট সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংহতি সমিতি, যুব সমিতি ও পিসিপির সদস্যদের তালিকা ও তথ্য চেয়ে একটি ফরম সরবরাহ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ও সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীর উপর এভাবে সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমসতাসীন দলের নিপীড়ন-নির্যাতন, রাজনৈতিক হয়রানি ও এলাকা ছাড়া করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকলে এবং জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ

রুদ্ধ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে বাধ্য হবে, যা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

৩. জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমের নামে জুম্ম বিরোধী কার্যক্রম

সারাদেশে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ তথা সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পার্বত্যাঞ্চলে সেই জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে ব্যবহার করা হচ্ছে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে। তিন পার্বত্য জেলায় জঙ্গীবাদ বিরোধী সমাবেশে জঙ্গীদের পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করে থাকে। এমনকি 'সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে জামায়াত-শিবিরের সাথে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সম্পর্ক ও সখ্যতা রয়েছে' মর্মে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট প্রচারণা চালাতে থাকে। 'বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন ছাড়াও মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে' বলে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকারান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় জঙ্গীগোষ্ঠীগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে।

গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, যুবসেনা ও ছাত্রসেনা নামক তিন জঙ্গী ও সাম্প্রদায়িক দল কর্তৃক ভূমি কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করলেও প্রশাসন ও আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে সেসব চুক্তি বিরোধী ও জঙ্গী সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ তাদেরকে নির্বিঘ্নে কর্মসূচি পালনের সুযোগ করে দেয়া হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ ও তার জোট সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সোচ্চার হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তাদের শাখাসংগঠনগুলো সেই সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদকে নানা কায়দায় পুরিপুষ্ট করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িকতার সুযোগে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় এসব জঙ্গী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে পাহাড় পর্বতময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে উর্বর ও অনুকূল ক্ষেত্র হিসেবে পেতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। এসব গোষ্ঠী এখন স্থানীয় প্রশাসন ও জাতীয় রাজনৈতিক দলসহ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিরাপদ পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা নানা বেশে ও আবরণে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

৪. উন্নয়নের নামে ভূমি বেদখল ও জুম্মদের উচ্ছেদ অব্যাহত

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে ইতিবাচক বিবেচনা করা হলেও তার বিপরীতে নানা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে জুম্মদের চিরায়ত ভূমি বেদখল ও ভূমি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে, রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণার নামে, হর্টিকালচার ও রাবার চাষের নামে বহিরাগতদেরকে ইজারা প্রদান করে হাজার হাজার একর জুমভূমি ও মৌজাভূমি জবরদখল করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক সাজেকে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের কারণে দুটি ত্রিপুরা গ্রামের ৬৫ পরিবার এবং বান্দরবানে বগা লেকের ৩১ পরিবার বম গ্রামবাসী উচ্ছেদের মুখে রয়েছে। বান্দরবান জেলার থানচি-আলিকদম উপজেলার ক্রাউডং পাহাড়ে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণার মাধ্যমে দুই শতাধিত জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলার আলুটিলা এলাকায় ৫১৮ পরিবারের জীবনজীবিকা বিপন্ন করে প্রায় ৭০০ একর জায়গার উপর এধরনের একটি পর্যটন জোন স্থাপনের পরিকল্পনা স্থানীয় জনগণের চাপের মুখে সরকার বাতিল করতে বাধ্য হয়। এছাড়া বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও সেটেলার কর্তৃক ভূমি দখলের কারণে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২২ জনের ভূমি কেড়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে ও ৩২টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন ঠেগামুখে একটি স্থল বন্দর নির্মাণসহ প্রতিবেশী ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ (প্রায় ১২৩.৫৪ কিলোমিটার) সড়ক নির্মাণের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরামর্শক সংস্থা ও সরকারের তথ্য মতে, উক্ত সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, ৫৬৪ পরিবার প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১০টি সাংস্কৃতিক অবকাঠামো (৩টি মসজিদ, ৩টি মন্দির ও ৪টি স্কুল) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ৩২টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু উল্লেখিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব দেয়া হয়েছে তা থেকে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী। ফলত এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংযোগ সড়কের কারণে আরো ব্যাপক ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। উক্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য ও জনমিতির উপর দীর্ঘমেয়াদী মারাত্মক প্রভাব পড়বে যেগুলো সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায় বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে এই সড়ক নির্মাণ করা হলে একদিকে অনেক গ্রামের জুম্ম অধিবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে পড়বে, অন্যদিকে বহিরাগত বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথভাবে কার্যকর ও শক্তিশালী করণ, পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ তথা স্থানীয়

অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান না হওয়া পর্যন্ত ঠেগা স্থল বন্দর স্থাপন এবং ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এই সংযোগ সড়ক পথ নির্মাণ বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে আসছে।

৫. ভূমি কমিশনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও দেনদরবারের পর অবশেষে গত ৯ আগস্ট তারিখে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০১৬ গেজেট আকারে প্রকাশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশ করা হয়। ভূমি কমিশন আইনের এই সংশোধনের ফলে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সংগঠনগুলো সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে এবং নানা উদ্ভট ও অযৌক্তিক বক্তব্য প্রদান করে ভূমি কমিশনের বিরোধিতা করে আসছে। পার্বত্য নাগরিক পরিষদ, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য গণপরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম-অধিকার আন্দোলন ও পার্বত্য বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ নামে সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত পাঁচটি উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন উক্ত আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় তিন পার্বত্য জেলা ও ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এবং সর্বশেষ গত ১০-১১ আগস্ট দুইদিন ব্যাপী তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের সভা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল পালন করে। তারা আরো কঠোর কর্মসূচির ঘোষণার হুমকি দিয়ে চলেছে। ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনীর বিরোধিতার নামে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর এই নাশকতামূলক ও জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও প্রশাসন অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আরো উদ্বেগজনক যে, উক্ত সংশোধিত আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি যাতে কোন ভূমিকা পালন করতে না পারে, সর্বোপরি ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পার্বত্য চুক্তি ও জুম্ম বিরোধী তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। সেনা-বিজিবি-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় শাখাসংগঠন কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক এবং ভূমি অধিকারের পক্ষে সক্রিয় কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের পেছনেও একই উদ্দেশ্য কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৬. জুম্ম নারী ও কন্যাশিশুর উপর সহিংসতা

জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণ এবং জুম্মদেরকে তাদের জায়গা-জমি থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার হাতিয়ার হিসেবে জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণসহ সহিংসতা অব্যাহতভাবে চালানো হচ্ছে। অতি সম্প্রতি জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও অপহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনায় জড়িত দোষীদের বিচার না হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত জুম্ম নারী ও শিশুরা নির্যাতন, নিপীড়ন, বৈষম্য, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা ও নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। ২০১৬ সালে বিগত নয় মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্তত ১৯ জন জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, যৌন ও শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে উদ্যোগহীনতা

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের তরফ থেকে কোন কার্যকর উদ্যোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কার্যাবলী হস্তান্তর এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ, 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহ সংশোধন, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকারের মধ্যে কোন ধরনের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না।

৮. উপসংহার

বর্তমানে জুম্ম জনগণের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করে জুম্ম জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ঠ কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অপপ্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে তোলা অনলাইন পত্রিকা, স্থানীয় সংবাদপত্র, নামে-বেনামে বই-পুস্তক প্রকাশ, সভা-সমিতির মাধ্যমে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি একটি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ সংগঠন, জুম্মরা উন্নয়ন বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি তকমা দিয়ে সরকারের মদদে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক এই তথ্য সন্ত্রাস জোরদার করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী অনুসারে ভূমি বিরোধ

৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারের কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ ও পার্বত্যবাসীর আপত্তি

চট্টগ্রামে চলমান তীব্র গ্যাস সংকট মোকাবেলায় দ্রুত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্স পরিচালনা মন্ডলীর ৩৬১তম সভায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ পটিয়া, জলদী, কাচলং ও সীতাপাহাড়- এই চারটি ভূ-গঠনে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান/ উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বের খ্যাতনামা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানীর সাথে বাপেক্স-এর যৌথ সহযোগিতা চুক্তি (Joint Venture Agreement) (জেভিএ) সম্পাদনের লক্ষ্যে Expression of Interest (ইওআই) আহ্বান করা হয়। তারই আলোকে গত ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে চীনের তিনটি প্রতিষ্ঠান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান- মোট চারটি প্রতিষ্ঠান ইওআই জমা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় একটি খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তি (জেভিএ) প্রস্তুত করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত যৌথ সহযোগিতা চুক্তিটি প্রস্তুত করা হয় 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০'-এর আলোকে এবং নাইকো'র সাথে ছাতক-ফেনী ফিল্ডসমূহের জন্য স্বাক্ষরিত যৌথ সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে।

উক্ত খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনে মতামত প্রদানের জন্য গত ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এবং গত ২৮ জুন ২০১৬ তারিখে পার্বত্য মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকদের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার কাচলং ও কাপ্তাই উপজেলার সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে যথাক্রমে ৯৭২.৭৭ বর্গ কিমি ও ৬৭৩.২৩ বর্গ কিমি এলাকা হতে তেল-গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ দু'টি ভূ-গঠন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ভূমি, নদী, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

যেহেতু উক্ত খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তিটি দেশের সমতল অঞ্চলের ছাতক-ফেনী ফিল্ডসমূহের জন্য নাইকোর সাথে স্বাক্ষরিত যৌথ সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, সেহেতু উক্ত যৌথ সহযোগিতা চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০' এর আলোকে এই যৌথ সহযোগিতা চুক্তিটি প্রস্তুত করা হয়েছে, ফলে এই যৌথ সহযোগিতা চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত প্রথাগত ভূমি অধিকারের বিষয়গুলো মোটেও বিবেচনায় আনা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলে বিশেষ শাসন কাঠামো রয়েছে- জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পর্যায়ে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান ও পাড়া বা গ্রামের কার্বারী) রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহ কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূগঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান বা উত্তোলন বিষয়ে সম্পৃক্ত রয়েছে। কিন্তু উক্ত যৌথ সহযোগিতা চুক্তিতে এসব বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ নেই।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পৃথক ও বিশেষ অঞ্চল হিসেবে পরিচিহ্নিত। যেহেতু খসড়া চুক্তিটি বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা বিচারে প্রস্তুত করা হয়েছে সেহেতু এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূগঠনে তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা

পরিষদ ও ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এ অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তিতে শুধুমাত্র বাপেক্স এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার চুক্তির সময় এবং অন্যান্য শর্তাবলী উল্লেখ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ইহার আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভারী বা বৃহৎ শিল্পের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করতে পারে। চুক্তিতে তা উল্লেখিত হয়নি। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তির অনুচ্ছেদ-৪-এ ছয়সদস্য বিশিষ্ট যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে ভিন্ন রূপ বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর কোন প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, কাচলং ও সীতাপাহাড় রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান। স্বভাবতই তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে বনাঞ্চল ও বনের জীব-বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সিলেটের লাউয়াছড়া বনাঞ্চলে শেভরণ কর্তৃক তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বনে আগুন ধরে যায় এবং জীব-বৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বনাঞ্চলের মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার যেখানে কার্বণ সংরক্ষণের জন্য বনাঞ্চল বৃদ্ধির মহাপরিকল্পনা নিয়েছে সেখানে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ধ্বংস করা কখনোই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদ যে কোন খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ লাভের অধিকারী। রাজস্বের হিস্যা, উত্তোলন ব্যবস্থা, ড্রিলিং সাইট, গ্যাস-লাইন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব, স্থানান্তর, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত খসড়া চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। গ্যাস অনুসন্ধান বা কূপ খনন কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাবের প্রথম শিকার হবে জুমচাষীরা। জুমচাষীদের জমি রেকর্ডীয় নয় বিধায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তারা চরম বৈষম্যের শিকার হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল যেহেতু দাহ্য পদার্থ তাই অনুসন্ধান কার্যক্রমের এলাকায় জুমচাষ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বিশেষ করে জুমচাষের প্রস্তুতি পর্বে কাটা জঙ্গল আগুন দিয়ে পোড়ানোর কাজ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হতে পারে। এতে করে জুম্ম জুমচাষীরা জুমচাষ থেকে বঞ্চিত হবে এবং এসব এলাকা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। খনিজ অনুসন্ধানের পরিবেশগত প্রভাবও মারাত্মকভাবে ক্ষতি করবে জুম্ম জনগণকে।

ভূমি সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই দু'টি ভূগঠন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ভূমি, নদী, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। খসড়া যৌথ সহযোগিতা চুক্তিতে সে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি অদ্যাবধি অমীমাংসিত রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ৯ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৬ সংশোধিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যক্রম এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভূমির মালিকানাস্বত্ব যথাযথভাবে পরিচিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উল্লিখিত কাচলং এবং সীতাপাহাড় ভূগঠনে তেল-গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত রাখা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বলে আমরা মনে করি। তাই এসব আইন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ তথা স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান না হওয়া পর্যন্ত কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা যায়।

গত ১০ অক্টোবর ২০১৬ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কাচলং ও সীতাপাহাড় এলাকায় তেল-গ্যাস উত্তোলন করা হলে এই এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়বে। হুমকিতে পড়বে জীববৈচিত্র্য। পাশাপাশি হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হবে। পাহাড়ে চলমান ভূমি বিরোধকে আরো জটিল করে তুলবে। সম্প্রতি সংসদে পাস হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৬ সংশোধনী কার্যকর আরো কঠিন হবে বলে উল্লেখ করেছেন রাঙ্গামাটি জেলার বিশিষ্টজনরা। সভায় বক্তারা বলেন, কাচলং ও সীতাপাহাড় এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ চলাকালে বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে সে-সংক্রান্ত কোনো জরিপ চালানো হয়নি। তেল-গ্যাস পাওয়া গেলে তা উত্তোলনের জন্য কত মানুষ উদ্বাস্তু হবে এবং তাদের পুনর্বাসনে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ করা হয়নি। পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাচালং ও সীতা পাহাড়ে তেল-গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ স্থগিতের দাবি জানান বক্তারা।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

লামায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন ৫নং ইউনিয়নের টংগাঝিরি গ্রামে গত ১৩ আগস্ট ২০১৬ সকাল ১০টায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক কম্পোনীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির এক ত্রিপুরা স্কুল ছাত্রী (১২) ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে ওই ছাত্রী প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। টংগাঝিরি পাড়া ফরিদ চেয়ারম্যানের খামার বাড়ি সংলগ্ন লাল মাটির রাস্তায় পৌছলে ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক সেটেলার মো: মোস্তাক ওই ছাত্রীকে পথে একা পেয়ে ঝাঁপটে ধরে এবং টেনে হিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। ধর্ষক মো: মোস্তাক চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন পুটিবিলা ইউনিয়নের ওয়াজউদ্দিন সিকদার পাড়ার মো: এজাহার মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে। ধর্ষণের শিকার ওই ছাত্রী বাড়িতে এসে ঘটনা সম্পর্কে তার মা-বাবাকে জানায়। পরে ওই ছাত্রীর বাবা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের ঘটনাটি জানান। কিন্তু সেটেলার বাঙালিরা ধর্ষণের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করে এবং ওই ছাত্রীর বাবাকে মামলা না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এদিকে ধর্ষণের শিকার ওই ছাত্রীর বাবা গরীব হওয়ায় মামলা করলে আর্থিকভাবে হয়রানীর শিকার হবে ভেবে মামলা করতে রাজী হয়নি। পরে এলাকাবাসীর পরামর্শে ওই ছাত্রীর অভিভাবকরা লামা থানায় ধর্ষণের মামলা করতে গেলে পুলিশও মামলা নিতে নানাভাবে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ওই ছাত্রীর বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করলে লামা থানায় এজাহার গ্রহণ করতে রাজী হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা কিশোরী ধর্ষিত

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিকাল তিনটায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের বান্দরছড়া মৌজার প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা (কার্বারী) পাড়ায় ১৪ বছরের এক আদিবাসী ত্রিপুরা কিশোরী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুইজন কলা ব্যবসায়ী সেটেলার বাঙালি ওই ত্রিপুরা গ্রামে কলা কিনতে যায়। পরে ওই কিশোরীকে বাড়িতে একা পেয়ে তারা জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময়ে ওই কিশোরীর মা-বাবা জুমে কাজ করতে গিয়েছিল বলে জানা যায়। এলাকার লোকজন বাজারে যাওয়ার সময় ওই কিশোরীর চিৎকার শুনে এগিয়ে এলে ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা পালিয়ে যায়। এ ধর্ষণের ঘটনায় গোমতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: ফারুক হোসেন লিটন ও মেম্বার মিলন কুমার ত্রিপুরা বিচারের আশ্বাস দেওয়ার পর অনেক দিন অতিবাহিত হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন বিচার হয়নি। এ ধর্ষণের ঘটনায় অভিভাবকরা এখনও থানায় মামলা করতে পারেনি।

ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা হল- মো: মালু মিয়া (১৭), পিতা: হারুন মিয়া, গ্রাম: তরুনীপাড়া, ৮নং ওয়ার্ড, গুমতি ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা এবং সুমন মিয়া (২৮), পিতা: শফিকুল ইসলাম, গ্রাম: গালামনি পাড়া, গুমতি ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

কাউখালীতে সেটেলার কর্তৃক এক মারমা কিশোরী ধর্ষণের শিকার

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১২ টায় রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার কচুখালী গ্রামে ১৭ বছরের এক মারমা কিশোরী সটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ওই কিশোরী কাউখালী ডিগ্রী কলেজের মানবিক বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী। তার বাড়ি কলমপতি ইউনিয়নের ছোটবটতলী গ্রামে। কিশোরীটি কয়েকজন সহপাঠী মিলে কার্বারীপাড়াধীন কচুখালী গ্রামে ভাড়া বাড়িতে ভাড়া থাকতো। ঘটনার সময় পূর্ব পরিচয় সূত্রে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন ইসলামপুর ইউনিয়নের বড়ইতল গ্রামের মাহবুব আলম (২৫) ঘরে এসে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময়ে কিশোরীটি বাড়িতে একা ছিল। মাহবুব আলম গ্রামে প্রবেশ করার সময় কয়েকজন যুবক পিছু অনুসরণ করে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে আটক করে। ধর্ষণের শিকার ওই মারমা কিশোরীর সহপাঠীদের অভিযোগ- মাহবুব আলম প্রেমের ফাঁদ পেতে কিশোরীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। রাতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে সালিশের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালি যুবককে ১০ হাজার টাকা এবং ধর্ষণের শিকার ওই মারমা কিশোরীকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা দায়ের করে ছেড়ে দেয়া হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা শিশু ধর্ষিত

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিকাল ৩টায় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের জালিয়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ত্রিপুরা শিশু স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় আমতলী ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল গণি মিয়া গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সকাল ১১টায় ইউপি কার্যালয়ে এক সালিশে ধর্ষককে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ঘটনার সময়ে ওই শিশুটি স্কুল ছুটি শেষে একা বাড়ি ফিরছিল। পথে সেটেলার গ্রাম জালিয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছুলে আগে থেকে ওঁতপেতে থাকা সেটেলার যুবক শিশুটিকে ধরে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে পথচারীরা শিশুটির চিৎকার শুনে এগিয়ে এলে সেটেলার গ্রাম জালিয়াপাড়ার মো: রঞ্জু মিয়ার ছেলে ধর্ষক সেটেলার মো: ফারুক হোসেন (২২) পালিয়ে যায়। পথচারীরা আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

এ ঘটনায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সকাল ১১টায় ইউপি কার্যালয়ে আমতলী ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল গণি মিয়া এক সালিশের আয়োজন করে। সালিশে সেটেলার ধর্ষককে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সালিশে ধর্ষককে জরিমানাকৃত টাকা দুই কিস্তিতে (১ম কিস্তি ১০ হাজার টাকা ও ২য় কিস্তি ২৫ হাজার টাকা) পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে। এ সালিশে উপস্থিত ছিল- সাবেক ইউপি মেম্বার জলক ভূষণ ত্রিপুরা, মহিলা মেম্বার (৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড) সঞ্জনা ত্রিপুরা, ৭নং ওয়ার্ড ইউপি মেম্বার মো: ইউনুস মিয়া, ৮নং ওয়ার্ড মেম্বার হেন্দু রঞ্জন ত্রিপুরা, গ্রামের কার্বারী পতি কুমার ত্রিপুরা।

বান্দরবানে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, ধর্ষক গ্রেফতার

বান্দরবান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দুপুরে ওই স্কুলের দপ্তরি অংথুইপ্রু মারমাকে (৩০) গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় বান্দরবান থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণির ওই শিশুকে কয়েক মাস ধরে স্কুল ছুটির পর বিদ্যালয়ের দপ্তরি অংথুইপ্রু মারমা ধর্ষণ করত। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ স্কুলে আবার ধর্ষণের চেষ্টা করলে শিশুটি পরিবারের কাছে বিষয়টি জানায়। একইভাবে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকেও ধর্ষণ করেছিল। পরে ওই শিশুটি অসুস্থ হলে পড়লে অভিভাবকদের জিঙ্গাসাবাদে স্কুলের দপ্তরি কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানায়। পরে অভিভাবকরা থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ স্কুলের দপ্তরি অংথুইপ্রু মারমাকে(৩০) গ্রেফতার করে। অংথুইপ্রু মারমা বান্দরবান মধ্যম পাড়ার মৃত চিংশৈউ মারমার ছেল।

কাউখালীতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা নারী গণধর্ষণের শিকার

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দুপুর ১২ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার উক্যজাই কার্বারী পাড়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ২০ বছরের এক মারমা যুবতী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় ওই কিশোরীর ছোট ভাই বাদী হয়ে তিনজন সেটেলার ধষর্কের নাম উল্লেখ করে কাউখালী থানায় মামলা দায়ের করেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুরে ওই মারমা নারী গ্রামের পাশ্ববর্তী টিএগুটি এলাকার সুমাজাই মারমার বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে বাড়ির আশ-পাশে আগে থেকে ওৎপেতে থাকা তিনজন সেটেলার বাঙালি বাড়িতে প্রবেশের পর ওই নারীকে জোরপূর্বক গণধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। এ সময়ে ওই বাড়িতে একজন অন্ধ বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিল না বলে জানা যায়। এ ঘটনায় গণধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর ছোট ভাই কাউখালী থানায় (মামলা নং- ০৭/ তাং- ২৯/০৯/২০১৬) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০(সংশোধন-২০০৩) এর ৯(৩) ধারায় মামলা দায়ের করে। পরে পুলিশ ধর্ষক মো: ইমরানকে গ্রেফতার করেছে।

ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা হল- ১) মো: মামুন ওরফে করিম (২২) পিতা: খোকন মিস্ত্রী, গ্রাম: জঙ্গল বগাবিল, কাউখালী; ২) মো: সোহেল (২০) পিতা: মৃত রইজুল ইসলাম, গ্রাম: রাঙ্গীপাড়া, কাউখালী এবং ৩) মো: ইমরান (২২) পিতা: সেকেন্ডার আলী, গ্রাম: রাঙ্গীপাড়া, কাউখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ত্রিপুরা কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার ধুলিয়া মৌজায় ব্রজেন্দ্র কুমার কার্বারী পাড়ায় ১৭ বছরের এক ত্রিপুরা কিশোরী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়ে এখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। জানা যায়, মাটিরাঙ্গা উপজেলার অযোধ্যা মৌজার অযোধ্যায় (লতিফ মেম্বার পাড়া) ওই ত্রিপুরা কিশোরীকে অনেক দিন ধরে ফুসলিয়ে ও ভয়ভীতি দেখিয়ে সেটেলার মো: আব্দুল মান্নান ধর্ষণ করত। পরে ওই কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ঘটনাটি পরিবারে জানাজানি হয়। এ ঘটনায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ চন্তি কুমার বৈষ্ণব ত্রিপুরার বাড়িতে এক বিচারের নামে সালিশ বসে। সালিশে অযোধ্যা গ্রামের (লতিফ মেম্বার পাড়া) মো: শাহ আলমের ছেলে ধর্ষক মো: আব্দুল মান্নান তার অপরাধের কথা স্বীকার করে।

ওই সালিশে উপস্থিত ছিল- মাটিরাঙ্গা ইউপি মেম্বার দিপার মোহন ত্রিপুরা, সাবেক ইউপি মেম্বার প্রবীণ কুমার ত্রিপুরা, গ্রামের কার্বারী ব্রজেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা, ভিডিপি পিসি মো: ইউসুফ আলী, সাবেক বেলছড়ি ইউপি মেম্বার মো: আব্দুল লতিফ মিয়া, সাবেক বেলছড়ি ইউপি মেম্বার মো: মনতাজ মিয়া, বেলছড়ি ইউপি মেম্বার মো: আলী মিয়া প্রমুখ। সালিশে ধর্ষণের শিকার অন্তঃসত্ত্বা কিশোরীকে ২০ হাজার টাকা ও ধর্ষক সেটেলার বাঙালিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।

বরকলে বিজিবি মসজিদের ইমাম কর্তৃক এক জুম্ম কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা

গত ৮ অক্টোবর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ৮:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার বরকল সদরস্থ ২২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবির) মসজিদের ইমাম মোঃ রাজ্জাক (৭০) কর্তৃক বরকল সদর বাজার এলাকায় এক জুম্ম কলেজ ছাত্রী (১৮) যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। ভুক্তভোগী কলেজ ছাত্রীটি বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী।

জানা গেছে, ঐদিন শনিবার ছিল বরকল বাজারের হাট বার। সকালে ঐ ছাত্রীটি বরকল বাজারে বাজার করার সময় কিছুটা ভীড়ের মধ্যে ওই ইমাম রাজ্জাক প্রথমে ছাত্রীটির বুকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হলে পরে পিছন থেকে স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করে। এতে ছাত্রীটি তার পায়ের জুতা দিয়ে ওই ইমামের গালে আঘাত করে। পরে ঐ ছাত্রীটিকে বিজিবির সদস্যরা তাদের চেক পোস্টে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটি জেনে নেয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাত্রীটিকে ছেড়ে দেয়। বিজিবির পক্ষ থেকে উপযুক্ত বিচার করার আশ্বাস দেয়া হয়। বিজিবির আশ্বাসে ঐ ছাত্রীটি কোন মামলা দায়ের থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একদিন পরে অর্থাৎ ৯ অক্টোবর জোন কমান্ডার মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে উল্টো ঘটনাকে ষড়যন্ত্র ও বিজিবির ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সংগঠিত করা হয়েছিল বলে দাবি করে ঘটনাটি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা করছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এ ঘটনার আগেও কয়েকবার ঐ ইমাম কয়েকজন নারীর সাথে খারাপ আচরণ করার চেষ্টা করেছেন। মান-সম্মানের ভয়ে কেউ বিচার দাবি না করলেও ভুক্তভোগীরা অনেকেই সমালোচনা করেছেন ঐ ইমামকে। জানা গেছে, এক সময় ঐ ইমাম রাজ্জাক বিজিবিতে চাকরি করেছিলেন এবং পেনশনে যাওয়ার পরে বিজিবির মসজিদে ইমামতি শুরু করেন।

---

৪০ পৃষ্ঠার পর

নিষ্পত্তি করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিরা ভূমি হারাবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙালি শূন্য হয়ে পড়বে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা হুমকির মধ্যে পড়বে বলে জাতি-বিদ্বেষী, উস্কানীমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সভাপতি সন্তু লারমাকে খুশী করতেই সরকার ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করেছে বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে নিয়ে দক্ষিণ সুদান বা পূর্ব তিমুর এর মতো পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জাতিসংঘসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলেও উদ্ভট ও কাল্পনিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। মূলত: পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে দমিয়ে রাখা এবং তাদের উপর দমন-পীড়নের হীনতৎপরতাকে বৈধতা প্রদানের সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এসব তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

বান্দরবানে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর হামলা

গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ বিকাল ৩:০০ টায় বান্দরবান সদর রাজার মাঠে 'আব্বাস ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৬' অনুষ্ঠিত হয়। এতে কালাঘাটা ক্লাব বনাম জাদীতং যুব সংঘের মধ্যে খেলা চলে।

এ সময়ে রেফারি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রোয়াংছড়ি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পুলু মারমা। খেলা শুরুর ৯০মি: সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ গোল দিতে না পারায় রেফারি আয়োজক কমিটির সাথে আলোচনা করে আরো অতিরিক্ত ১৫মি: সময় বৃদ্ধি করে খেলা শুরু করে। অতিরিক্ত সময়ে খেলা শুরুর সাথে সাথে জাদীতং যুব সংঘ দল কালাঘাটা ক্লাবকে একটি গোল দেয়। কিন্তু কালাঘাটা ক্লাবের খেলোয়াড়রা গোলটি মানতে রাজি নয়। এ নিয়ে বাকবিতন্ডা ও হাতাহাতির এক পর্যায়ে কালাঘাটা ক্লাবের খেলোয়াড়রা রেফারির উপর হামলা ও ধাওয়া করলে তিনি পালিয়ে মাঠের পার্শ্ববর্তী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি'র বাসভবনে আশ্রয় নেয়। পরে বান্দরবান জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অজিত কান্তি দাসের উস্কানীতে কালাঘাটা ক্লাব দলের লোকজন ও সমর্থক হিন্দু বাঙালিরা মধ্যম পাড়া ও উজানিপাড়ায় জুম্মদের উপর হামলা চালায়। পুলিশ এসে হামলাকারীদের ধাওয়া করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ হামলায় কোন জুম্ম মারাত্মক আহত না হলেও আবারও রাতে হামলার আশঙ্কায় সারারাত মধ্যম পাড়া, উজানি পাড়া, কলাপাড়া, জাদিপাড়াসহ বান্দরবান পৌর এলাকার জুম্মরা আতঙ্কে ছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ বান্দরবান সদরে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এবারও আওয়ামীলীগ নেতা অজিত কান্তি দাসের উস্কানীতে জুম্মদের উপর হামলা, সহিংসতা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে জানা যায়।

রামগড়ে ভূমি বিরোধের জের ধরে জুম্ম ও সেটেলার বাঙালি মারামারি, উভয়ে আহত

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ সকাল সাড়ে আটটায় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের গুজা এলাকায় ভূমি বিরোধে জের ধরে এক জুম্ম ও সেটেলার বাঙালির মধ্যে মারামারি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এতে উভয়ে আহত হয়। জানা যায়, জুম্মদের ভূমি জবরদখল করে ওই সেটেলার বাঙালি কচুচাষ করেছিল। এ নিয়ে সেটেলার বাঙালিদের সাথে স্থানীয় জুম্মদের অনেকদিন ধরে বাকবিণ্ডতা চলে আসছিল। ঘটনার সময় ওই সেটেলার বাঙালি মুখী কচু তুলতে গেলে ওই ভূমির মালিক এতে বাঁধ দেয়। এ নিয়ে বাকবিণ্ডতার একপর্যায়ে কচুচাষী সেটেলার মো: সাদেক মিয়া (৪৫) দা দিয়ে রূপধন চাকমার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। পরে উভয়ে মধ্যে মারামারি হয়। এ ঘটনায় রূপধন চাকমা (৪০) ও সেটেলার মো: সাদেক মিয়াউভয়ে আহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেটেলার মো: সাদেক মিয়াকে মারাত্মক আহত অবস্থায় রামগড় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। সেনাবাহিনী ও বিজিবি গ্রামে টহলে দেয়। জুম্মদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

লামায় ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গা ও সন্ত্রাসী কর্তৃক বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, দু'জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও জামিনে মুক্তি

গত ২ অক্টোবর ২০১৬ দিবাগত রাত ২.৩০ ঘটিকার সময় বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের বনপুর বাজারস্থ রাজাপাড়া বিল বৌদ্ধ বিহারে এলাকায় ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ২০/৩০ জন বহিরাগত রোহিঙ্গা ও মৌলবাদী সন্ত্রাসী অনধিকার প্রবেশ করে বুদ্ধমূর্তি ভাংচুর ও চুরি করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে গত ৪ অক্টোবর ২০১৬ রাজাপাড়া বিল বৌদ্ধ বিহারের সভাপতি মং থোয়াই চিং মারমা বাদী হয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাকের হোসেন মজুমদার ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী আজিম, জসিম, কালাম, লুৎফর, শাহ আলমসহ ৯/১০ জন ব্যক্তিকে আসামী করে লামা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন বলে জানা গেছে। মামলা নং- ০১, তারিখ- ০৪/১০/২০১৬ খ্রিঃ। ঐ সময় পুলিশ প্রশাসন তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করলে পরে তারা জামিনে ছাড়া পায়। বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা, প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় গ্রেফতারকৃতরা জামিনে সাড়া পাওয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করার প্রতিবাদে এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রবারণা পূর্ণিমা পালন বর্জন করা হয়।

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

আলিকদমে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ৬ জনকে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন

গত ১ আগস্ট ২০১৬ বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলাধীন জানালী পাড়া ক্যাম্পের সেনারা জনসংহতি সমিতির দুইজন সদস্যসহ ছয়জন জুম্ম গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে আটকে রাখে। সেনা সদস্যরা আটককৃতদেরকে ১ আগস্ট জানালী ক্যাম্পে এবং ২ আগস্ট আলিকদম জোনে আটকে রাখে। তার পরদিন ৩ আগস্ট রাত ৮:০০ টায় সেনারা তাদেরকে ছেড়ে দেয় এই শর্ত আরোপ করে যে, পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে অপহৃত পত্যা মোহন চাকমাকে উদ্ধার করতে হবে এবং উদ্ধার করতে না পারলে ক্যাম্পে এসে হাজির হতে হবে। উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই কে বা কারা আলিকদম উপজেলার মেরিনচর ম্রো পাড়ার অধিবাসী পত্যা মোহন চাকমা নামে একজন জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। আটককৃতদেরকে সেনা সদস্যরা উক্ত অপহরণ ঘটনায় জড়িত করার চেষ্টা করে বলে জানা গেছে। ক্যাম্পে আটকে রাখা জুম্ম গ্রামবাসীরা হলেন-

১. দয়া মোহন চাকমা, গ্রাম বেগ্রা কার্বারী পাড়া;
২. আপুইঅং মারমা (৪০), গ্রাম ছক্রাঅং মারমা পাড়া;
৩. হ্লাথোয়াইচিং মারমা (৪০), গ্রাম ছক্রাঅং মারমা পাড়া;
৪. বাবুল মারমা (২৫), গ্রাম ছক্রাঅং মারমা পাড়া;
৫. শুক্করসেন চাকমা (৪২), বেগ্রা কার্বারী পাড়া;
৬. বেগ্রা কার্বারী (৪৫), বেগ্রা কার্বারী পাড়া।

আটককৃতদের মধ্যে দয়া মোহন চাকমা জনসংহতি সমিতির আলিকদম থানা কমিটির সদস্য ও নয়া পাড়া ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বেগ্রা কার্বারী জনসংহতি সমিতির সদস্য। সেনা সদস্যরা দয়া মোহন চাকমা, আপুইঅং মারমা, হ্লাথোয়াইচিং মারমা ও বাবুল মারমাকে বেদম মারধর করে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে কোন কিছু ঘটনা ঘটলে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যসহ নিরীহ জুম্মদের জড়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বান্দরবানে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে জনসংহতি সমিতি ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের

জেলে থাকা অবস্থাতেই উছোমং মারমাকে এক নম্বর আসামি

গত ১৮ আগস্ট ২০১৬ বান্দরবানে আবারও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে মংসানু মারমা নামে জনৈক রিপোর্টার্স ইউনিটির স্বঘোষিত সভাপতি ও আওয়ামীলীগের সমর্থক কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬ জন সদস্যকে আসামী করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৩০/৪০ জনের নাম উল্লেখ করে বান্দরবান সদর থানায় নতুন একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অপর একটি মিথ্যা মামলায় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত এবং জেলে অন্তরীণ পিসিজেএসএসের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমাকেই উক্ত নতুন মামলায় এক নম্বর আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মামলার এজাহারে 'গত ১১ অক্টোবর ২০১৪ জেএসএস ও পিসিপি সদস্যরা সশস্ত্র সহযোগীসহ বান্দরবান রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এসে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে', '১৭ অক্টোবর ২০১৪ জেএসএস সদস্যরা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ের জায়গাটি জোরপূর্বক নিজেদের জায়গা বলে দাবি করে', '২৫ অক্টোবর ২০১৬ উক্ত আসামীরা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এসে জোরপূর্বক এক লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয়' এবং 'সর্বশেষ গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ জেএসএস সদস্যরা ৩০/৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীসহ রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এসে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গলা চেপে ধরে এবং ভয় দেখিয়ে ৪৫ হাজার টাকাসহ একটি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়' ইত্যাদি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৩ জুন ২০১৬ বান্দরবানের রাজভিলায় আওয়ামীলীগের সদস্য মংপু মারমা অপহরণের শিকার হলে স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও প্রশাসনের একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় তার পরের দিনই উক্ত ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়িত করে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের ৩৮ জন সদস্যের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত ঘটনার পর স্থানীয় আওয়ামীলীগের ষড়যন্ত্রে পুলিশ ও সেনাবাহিনী জনসংহতি সমিতির বান্দরবান থানা শাখার সভাপতি উচসিং মারমাসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রেপ্তারকৃত ১১ জনের মধ্যে উচসিং মারমাসহ ৭ জন এজাহারভুক্ত আসামী নন।

সম্প্রতি উক্ত মংপু মারমা অপহরণ মামলায় অভিযুক্ত উছোমং মারমাসহ জনসংহতি সমিতির ১০ জন সদস্য হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন লাভ করেন। জামিন পেয়ে ৩১ জুলাই উছোমং মারমা বান্দরবান সদরের কালাঘাটাস্থ তাঁর বাড়িতে পৌছলে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঐদিনই রাত ১:০০ টার দিকে তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। জানা যায় যে, উছোমং মারমাকে ধরার পর ১ আগস্ট ২০১৬ মো: আব্দুল করিম নামে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের জনৈক আওয়ামীলীগ নেতা কর্তৃক জামিন লাভ করা জনসংহতি সমিতির ৭ জন সদস্যসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর থানায় তাৎক্ষণিকভাবে চাঁদাবাজির মিথ্যা

অভিযোগ এনে আবার একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করার পূর্বেই উছোমং মারমাকে গ্রেফতার করা হলেও উক্ত মামলায় উছোমং মারমাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তবে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান থানা শাখার সভাপতি উচসিং মারমা গত ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গত ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মুক্তি পান।

বান্দরবানে জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে আরও একটি মিথ্যা মামলা দায়ের

গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ বান্দরবানে স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও সেনা-পুলিশ প্রশাসনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মোঃ মহিউদ্দিন (৪৮) পীং-মোঃ নূরুল আলম নামের এক ব্যক্তিকে বাদী করে চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র নেতাকর্মীসহ ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামী করে বান্দরবান সদর থানায় আরও একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বিবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করে যানবাহন ভাঙচুর, চাঁদা দাবি, মারধর করে টাকা ছিনতাইসহ বিভিন্ন বানোয়াট ও সাজানো অভিযোগ আনা হয়। মামলা নং ১৮, তারিখ ২৩/৮/১৬, ধারা ৪/৫, আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৯)। উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উক্ত মামলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও নোয়াপতং ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সমিতির কেন্দ্রীয় কৃষি ও ভূমি বিষয়ক সম্পাদক চিংলামং চাক, পিসিপির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উবাচিং মারমাসহ জেএসএস ও পিসিপি-র ১৬ জন নেতাকর্মী ও সমর্থককে আসামী করা হয়। বলাবাহুল্য, এজাহারে বর্ণিত তথাকথিত ঘটনার সময়ে উক্ত বিবাদীদের অনেকেই সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে বান্দরবানের বাইরে অবস্থান করছিলেন।

রোয়াংছড়িতে জুম্ম গ্রামে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক তল্লাশী অভিযান তালা ভেঙ্গে জেএসএসের কার্যালয়ের জিনিসপত্র তছনছ

গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ ভোর রাত ৩:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য আবারও বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা ও বান্দরবান সদর উপজেলার তিনটি জুম্ম গ্রামে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে হয়রানিমূলক তল্লাশী অভিযান চালিয়েছে। উক্ত তল্লাশী অভিযানে ১৯ বীর বান্দরবান সেনা জোনের কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল হায়দারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ৯টি জুম্ম বাড়িতে তল্লাশী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে, চার ব্যক্তিকে এক ঘন্টার অধিক আটক করে রাখে এবং তালা ভেঙে জনসংহতি সমিতির কার্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ করে কাগজপত্র তছনছ করে।

জানা গেছে, ১৯ বীর বেঙ্গলের বান্দরবান সেনা জোনের কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল হায়দার-এর নেতৃত্বাধীন শ' খানেক সেনাসদস্য তিনটি দলে ভাগ হয়ে প্রায় একই সময়ে রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ওয়াগোই পাড়া গ্রামে ও নাথিংঝিরি পাড়া গ্রামে এবং বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান সদর ইউনিয়নের শামুকঝিরি পুনর্বাসন পাড়া গ্রামে উক্ত তল্লাশী অভিযান চালায়। এই তল্লাশী অভিযানে সেনাসদস্যরা ওয়াগোই পাড়া গ্রামে 'সন্ত্রাসী আছে কিনা জিজ্ঞেস করে' পর পর ৭টি বাড়িতে ঢুকে হয়রানিমূলকভাবে তল্লাশী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে। একইভাবে অপর সেনাসদস্যরা নাথিংঝিরি পাড়া গ্রামে একটি বাড়িতে এবং শামুকঝিরি পাড়া গ্রামে আরেকটি বাড়িতে তল্লাশী অভিযান চালায়। সেনা অভিযানে যাদের বাড়ি তল্লাশী করা হয়েছে তারা হলেন–

১. মাওসেতুং তঞ্চঙ্গ্যা (৪০) পীং-মৃত ঘনেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
২. অনীল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং-বিমল কার্বারী, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
৩. বিমল কার্বারী (৭০) পীং-মৃত ভালাধন কার্বারী, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
৪. কৃষ্ণ তঞ্চঙ্গ্যা (৩৩) পীং-মোহন লাল তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
৫. আদ্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৫৫) পীং-মৃত ইন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
৬. বিশ্বনাথ তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫) পীং-মোহন লাল তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া (আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান);
৭. জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (৬৫) পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া (বান্দরবান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক);
৮. সানু তঞ্চঙ্গ্যা (৩৬) পীং-মৃত জীতেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- নাথিংঝিড়ি পাড়া;
৯. রাংগো তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) পীং-নাক কালা তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- শামুকঝিরি পাড়া (তার জুম ঘরে তল্লাশী অভিযান চালানো হয়)। তল্লাশী অভিযানের সময় এক ঘন্টার অধিক সময় ধরে সেনাসদস্যদের হাতে হয়রানিমূলকভাবে আটকের শিকার ৪ ব্যক্তি হলেন–

১. রবিসেন তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) পীং-মৃত ঘনেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ওয়াগোই পাড়া;
২. উত্তম তঞ্চঙ্গ্যা (২২) পীং-মৃগসেন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ঐ;
৩. রবিময় তঞ্চঙ্গ্যা (২০) পীং-দুলমনি তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- নাথিংঝিরি পাড়া;
৪. সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (২২) পীং-লেটু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- তুলাছড়ি শুকনাঝিরি পাড়া (বান্দরবান সদর ইউনিয়ন)।

আরো উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা কোন প্রকার অনুমতি বা বৈধ নির্দেশ ব্যতিরেকে ওয়াগোই পাড়া গ্রামে অবস্থিত জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ের তালা ভেঙে কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তছনছ করে দেয়।

বালুখালীতে স্থানীয় সেনাক্যাম্পের সদস্যদের কর্তৃক এক গ্রামবাসীর বাড়ি ঘেরাও ও হয়রানি

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় রাজমনি পাড়া সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য বালুখালী ইউনিয়নের কেল্যামুড়া কার্বারী পাড়া নিবাসী লক্ষীধন চাকমা (৩০) পীং-চিগন চান চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। এসময় লক্ষীধন চাকমা বাড়িতে ছিল না। এসময় সেনাসদস্যরা লক্ষীধন চাকমাকে খোঁজ করে এবং বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তল্লাশীর সময় সেনাসদস্যরা ২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের একটি চিঠি পেলে সেটি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় লক্ষীধন চাকমার স্ত্রীকে বলে যায় যে, তার স্বামী যেন তার পরের দিন শুক্রবার ক্যাম্পে গিয়ে কম্যান্ডারের সাথে দেখা করে। এরপর লক্ষীধন গ্রামের মেম্বার বিপ্লব ত্রিপুরা, কার্বারী সন্তোষ ত্রিপুরা ও মহিলা মেম্বার জীবনাশ্রী ত্রিপুরাকে নিয়ে ক্যাম্পে যায় এবং ক্যাম্প কম্যান্ডারের সাথে দেখা করে। এ সময় কার্বারী ও মেম্বাররা ক্যাম্প কম্যান্ডারের কাছে লক্ষীধনকে খোঁজ করা এবং ক্যাম্পে ডেকে পাঠানোর কারণ জানতে চাইলে ক্যাম্প কম্যান্ডার লক্ষীধন চাকমা চাঁদা আদায় করে বলে তথ্য পেয়েছে বলে জানায়। ক্যাম্প কম্যান্ডারের এই কথায় মেম্বার-কার্বারীরা অভিযোগ দাতার পরিচয় জানতে চাইলে কম্যান্ডার কোন জবাব দেননি।

গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রনেতা সুনীতিময় চাকমার মুক্তি

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র বিলাইছড়ি উপজেলা কমিটির অর্থ সম্পাদক সুনীতিময় চাকমা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। উল্লেখ্য, তিনি গত ১৪ জুন ২০১৬ বিলাইছড়ি থানায় দায়েরকৃত এক মিথ্যা মামলায় বিলাইছড়ির দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তার হন।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি অফিসের তালা ভেঙে আসবাবপত্র ভাঙচুর

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ভোর রাত ৩:৩০ ঘটিকায় বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনা সদস্য জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময়ে সেনা সদস্যরা আলমিরা ভেঙে ফাইলপত্র, সভার কার্যবিবরণী বহি, জনসংহতি সমিতির মুখপত্র 'জুম্মবার্তা' নিয়ে যায় এবং কার্যালয়ের আসবাবপত্র ভাঙচুর ও নেতাদের ছবি তছনছ করে।

জানা যায়, সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিনাঅনুমতিতে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে প্রবেশ করে আলমিরা ভেঙে সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কমিটির ইউনিয়ন কমিটি সংক্রান্ত ৪টি ফাইল, থানা কমিটি ফাইল, চিঠি প্রেরণ ও গ্রহণ, সদস্য সংগ্রহ, সাংগঠনিক প্রতিবেদন, পেপার কাটিং, স্টক রেজিস্টার, কার্যবিবরণী বহি, সালিশী বৈঠক ইত্যাদি সংক্রান্ত ফাইলপত্র, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সমিতির মুখপত্র 'জুম্মবার্তা'সহ বিভিন্ন প্রকাশনা ও বইপত্র নিয়ে যায়। এছাড়াও কার্যালয়ে টাঙানো জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অন্যান্য নেতাদের ছবি তছনছ করে ফেলে দিয়ে যায়।

আরও উল্লেখ্য যে, গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখও ভোর রাত ৩:০০ টার দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য তালা ভেঙে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ করে কাগজপত্র তছনছ করে ও কার্যালয়ে টাঙানো বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের ছবি নিয়ে যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা অফিস তল্লাসী, ভাঙচুর ও দলিলপত্র ছিনতাই

লামায় স্বপন আসামের বাড়ি তল্লাশী, ভাঙচুর

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১১:০০ টার দিকে বান্দরবান সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য ও পুলিশ বিনা অনুমতিতে বান্দরবান জেলা সদরে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশী অভিযান চালিয়েছে। এসময় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সমিতির কার্যালয়ে থাকা আলমিরাসহ আসবাবপত্র ভেঙে দেয় এবং কার্যালয়ের বিভিন্ন দলিলপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। যাওয়ার সময় ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিপিইউ, ইন্টারনেটের মডেম, কার্যালয়ের ফাইলপত্র, একটি ডিজিটাল ক্যামেরা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী তথাকথিত তল্লাশী চালিয়ে রাত ১২:০০ টার দিকে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা চলে যায়।

অপরদিকে একই তারিখে রাত ১১:৩০ টায় বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় জনসংহতি সমিতির লামা উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসামের বাড়িতেও তল্লাশী চালিয়েছে আলীকদম সেনা জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল সেনা ও পুলিশ সদস্য। এ সময় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা স্বপন আসামের বাড়িতে থাকা জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির বিভিন্ন দাপ্তরিক কাগজপত্র ও বইপত্র নিয়ে যায়। সমিতির লামা থানা কমিটির বর্তমানে কোন কার্যালয় না থাকায় স্বপন আসামের বাড়িতেই উক্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়। সেনা ও পুলিশ সদস্যরা যাওয়ার সময় 'সংগঠনের কাগজপত্র ব্যতীত কোন মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয় নাই' মর্মে স্বপন আসামের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পত্র নিয়ে যায়। এছাড়া আরও বলে যায় যে, সেনাক্যাম্পের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান করলে যেন তাদের অনুমতি নেয়া হয়।

বাঘাইছড়িতে মুকুল কান্তি চাকমা অন্তর্ধানের জেরে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় ৪ জনকে জেলে প্রেরণ

অবসরপ্রাপ্ত সেনা সার্জেন্ট মুকুল কান্তি চাকমা অন্তর্ধানের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় রাঙ্গামাটি জেলা আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ মঙ্গলবার, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি

উপজেলার চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমাসহ জনসংহতি সমিতির চারজন সদস্যকে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে। গ্রেফতারকৃত আরো অন্যান্যরা হলেন- জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা (কাকলী), সহ সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীব চাকমা (দ্বীপ) এবং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য অজয় চাকমা। উল্লেখ্য, এর আগে গ্রেফতারকৃতরা হাই কোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের অগ্রিম জামিন নিয়েছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিন শেষ হয়ে আসায় রাঙ্গামাটি জেলা আদালত থেকে ঐদিন জামিন নিতে গেলে আদালত তাদেরকে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গত ৩০ মে ২০১৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সেনা সার্জেন্ট মুকুল কান্তি চাকমা বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর অজ্ঞাতকারণে অন্তর্ধান হয়ে যান কিংবা কে বা কারা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। জানা যায়, তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন না, তবে অবসর গ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে জড়িত হন বলে জানা যায়। তিনি কি ব্যবসায়িক কারণে বা অন্য কোন কারণে অন্তর্ধান হয়েছেন বা অপহৃত হয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় একমাস পরও তার কোন হদিশ না মেলার পর পূর্ব কোন অভিযোগ ছাড়াই পুলিশসহ প্রশাসন ও সংস্কারপন্থীদের উস্কানীতে অপহৃতের মেয়ে নমিসা চাকমা বাদী হয়ে গত ৪ জুলাই ২০১৬ রহস্যজনকভাবে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি প্রভাত কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা, সহ-সভাপতি ত্রিদিপ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক খোকন চাকমাসহ ৯ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ০১, তাং- ০৪.৭.১৬, ধারাঃ ৩৬৪/১০৯/৩৭৯/৩০ দঃবিঃ।

উল্লেখ্য যে, মুকুল কান্তি চাকমা অন্তর্ধান বা অপহৃত হওয়ার পর তার পরিবার এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সহযোগিতা চাইলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরও উক্ত ঘটনায় জড়িত করে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে সাজিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি বান্দরবানসহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রাজনৈতিকভাবে হয়রানি ও দমন-পীড়ন করার উদ্দেশ্যে একটি মহল জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে যেভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করে চলেছে ঠিক একই উদ্দেশ্যে ঐ মহলটির প্ররোচনায়ই বাঘাইছড়িতে এই মামলা দায়ের করা হয়। তবে সম্প্রতি গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ জামিনে মুক্তি পান জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সহ-সভাপতি ত্রিদিপ চাকমা এবং এরপর গত ২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ জামিনে মুক্তি পান একই কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা ও স্থানীয় ইউপি সদস্য অজয় চাকমা।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রাম কার্বারীসহ দুইজনকে মারধর

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১:৫০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য তারাছা ইউনিয়নের নোয়াপতং মুখ পাড়ায় গিয়ে অভিযানের নামে পাড়ায় তল্লাশী চালিয়ে পাড়ার কার্বারী গং মুই উ মারমা (৫৫), জনসংহতি সমিতির নোয়াপতং মুখ গ্রাম কমিটির সদস্য ক্যম্রা অং মারমা (৪৫) ও মংয়ই উ মারমা (৪০)-কে মারধর করে শারীরিকভাবে জখম করেছে। এই তল্লাশী ও মারধর করার সময় সেনাসদস্যদের সাথে মুখোশধারী কিছু লোকজনকেও দেখা গেছে।

বান্দরবানে পুলিশের বাড়াবাড়ি নির্দেশনা

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ৮:৩০ ঘটিকায় বান্দরবান সদরের একদল পুলিশ সদস্য উজানী পাড়ার দোকানদার উসাইন মারমাকে নির্দেশ দিয়ে যায় যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যরা তার দোকানে আসে। আসলে তাদের দোকানে কোন চা না দিতে, এমনকি বসতেও না দিতে বলে যায়। আসলে পুলিশকে তথ্য দিতে নির্দেশ দিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পুলিশ উসাইন মারমার মোবাইল নম্বরও নিয়ে যায়।

আলিকদম জোন কর্তৃক পুঁজিখাল মংপাইং খয় কার্বারী পাড়ায় কার্বারীর ছেলেকে মারধর
জনসংহতি সমিতি, যুব সমিতি ও পিসিপি সদস্যদের তালিকা খোঁজ

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার আলিকদম ইউনিয়নে পুঁজিখাল মংপাইং খয় কার্বারী পাড়ায় কার্বারীর ছেলে টোটুল ম্রোকে দুপুরে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করেছে আলিকদম জোনের সেনাসদস্যরা। সেনাসদস্যরা গ্রামে শান্তিবাহিনী এসেছে কিনা জানতে চাইলে টোটুল ম্রো জানে না বলার পরই সেনাসদস্যরা তাকে নির্মমভাবে মারধর করে।

লামায় আলিদকম সেনা জোন থেকে লামা বাজারের নিশি আর্ট এন্ড কম্পিউটার সেন্টারকে মানা করে দিয়েছে ভূমি সংক্রান্ত কোন দরখাস্ত এবং জনসংহতি সমিতির কোন কিছু কম্পোজ করা যাবে না বলে। এছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ আলিকদম সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে. কর্নেল সারোয়ার হোসেন স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মীদের মাধ্যমে আলিকদমের গ্রামে গ্রামে গ্রামের মুরুব্বীদের নিকট সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংহতি সমিতি, যুব সমিতি ও পিসিপির সদস্যদের তালিকা ও তথ্য চেয়ে 'একটি ফরম' সরবরাহ করেছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে একই দিন বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি ইউনিয়নে ব্যাঙছড়ি সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার পার্শ্ববর্তী গ্রামের কার্বারীদের ক্যাম্পে ডেকে একটি সভা করেন। সভায় ক্যাম্প কম্যান্ডার কার্বারীদের দায়িত্ব দেন যে, কার্বারীরা যেন তাদের গ্রামের জনসংহতি সমিতি, পিসিপি ও যুব সমিতির সদস্যদের তালিকা ক্যাম্পে জমা দেন।

বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির নেতা জলিমং মারমার বাড়ি ঘেরাও ও তল্লাসী

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় একদল সেনা ও পুলিশ সদস্য বান্দরবান জেলা সদরস্থ মধ্যম পাড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমার বাসা ঘেরাও করে। সেনা-পুলিশদের মধ্য থেকে অজয় নামের এক পুলিশ ও সিভিল পোশাক পরিহিত অপর এক ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে জলিমং মারমাকে খোঁজ করে। জলিমং মারমার স্ত্রী তাঁর স্বামী এসময় বাড়িতে নেই জানালে পুলিশ সদস্যটি রান্নাঘরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। বাড়ির বাইরে থাকা সেনা ও পুলিশ সদস্যরাও সেসময় সেখান থেকে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা জলিমং মারমাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি এস লনচেও-এর বাসা তল্লাশী চালিয়ে চালায়। সেসময় ভিক্টর বমকে উবাসিং মারমা মনে করে জিজ্ঞাসা করে। ভিক্টর বমের আইডি কার্ড মোবাইলে ছবি তুলে নেয়।

উল্লেখ্য, তার আগের দিনও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত প্রায় ১২:৩০ টার দিকে জলিমং মারমাদের বাসায় পুলিশ যায়। তারা দরজায় টোকা দেওয়ার পর দরজা খুলে দিলে পুলিশ নিজেরাই 'নাই বোধ হয়' বলাবলি করে চলে যায়।

বরকলের ভূষণছড়ায় জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ

অতি সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে ১৪৯নং গুইছড়ি মৌজাধীন চান্দবীঘাট এলাকায় একদল বিজিবি সদস্য মনুভদ্র চাকমা (৪৯) পীং-মৃত টেঙারাম চাকমা নামের এক জুম্ম গ্রামবাসীর রেকর্ডভুক্ত ভূমি বেদখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের কাজ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গত ১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ থেকে ২২ বিজিবি এর বরকল সদর জোনের একদল বিজিবি সদস্য ঐ ভূমির মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকেই ঐ টিলা ভূমিতে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং টিলার গাছ ও জঙ্গল কাটা শুরু করে। জানা গেছে, হোল্ডিং নং ১৯১ (আর) এর মূলে মনুভদ্র চাকমার তিন (৩) একর পরিমাণ রেকর্ডভুক্ত টিলা ভূমি রয়েছে, যাতে সেগুন গাছসহ বিভিন্ন গাছ রয়েছে। বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য ঐ গাছ বর্তমানে কেটে ফেলা হচ্ছে।

লংগদুতে সেনাসদস্য কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশী ও জিনিসপত্র তছনছ

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলায় লংগদু সেনা জোনের আওতাধীন বামে লংগদু সাব জোনের কমান্ডার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ খায়রুল এর নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার ৭নং লংগদু ইউনিয়নের মধ্য খাড়িকাবা গ্রামের বাসিন্দা গোপাল চাকমা (৩৫) পীং-মৃত গঙ্গাধর চাকমার বাড়িতে তল্লাশী চালায় এবং জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। দরজায় তালা মারা ঘরটিতে সেনাসদস্যরা ঘরের দুটি জানালা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশী চালায় এবং ঘরের জিনিসপত্র তছনছ ও নষ্ট করে দেয়। উল্লেখ্য, গোপাল চাকমা একজন বোট চালক, এসময় সে বাড়িতে ছিল না। অপরদিকে এসময় গোপালের স্ত্রী ঘরে তালা মেরে ছেলেমেয়েদের পার্শ্ববর্তী স্কুলে নিয়ে যায়।

রাজস্থলীর জেএসএস নেতা সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে বান্দরবান থেকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলায় জড়িত

গত ২১ অক্টোবর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় বান্দরবান জেলা সদরের উজানি পাড়া এলাকা থেকে কোন মামলা ও ওয়ারেন্ট না থাকলেও জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে গ্রেপ্তার করেছে বান্দরবান সদর থানার এস আই বেলাল এর নেতৃত্বাধীন একদল পুলিশ। জানা গেছে, ইতোমধ্যে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে বান্দরবানে আসা তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতেই আজ সকালে রাজস্থলী থেকে বান্দরবানে পৌছেন সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চু। তিনি রাজস্থলী থেকে মোটর সাইকেলসহ এর চালক উমং মারমাকে ভাড়া করে নিয়ে যান। জানা গেছে, সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে থানায় নিয়ে গিয়ে ইতোমধ্যে বান্দরবানে দায়েরকৃত দুইটি মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় জড়িত করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অথচ ঐ মামলায় সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুর নামের উল্লেখ ছিল না।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক উপজেলা পিসিপির সভাপতি আটক

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ সকাল প্রায় ১১:৩০ টার দিকে বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের বাজার এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র রোয়াংছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উহ্লা অং মারমাকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনা সদস্য। উহ্লা অং মারমাকে প্রথমে রোয়াংছড়ি সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর সেখান থেকে বান্দরবান সদরস্থ সেনা ব্রিগেডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় সারাদিন বসিয়ে রেখে অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পিসিপি করতে পারবে না সহ বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে বিকাল প্রায় ৫:৩০ টার দিকে উহ্লা মং মারমাকে ছেড়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, উহ্লা অং মারমার বিরুদ্ধে কোন মামলা ও ওয়ারেন্ট না থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক তাকে এভাবে আটক করা ও হয়রানি করা ঘটনা বেআইনী, হয়রানিমূলক ও সেনাত্রাস সৃষ্টির সামিল বলে বিবেচনা করা যায়।

সংগঠন সংবাদ

চবিতে শহীদ মংসচিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে শহীদ মংসচিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগ্রামী সভাপতি রিতিশ চাকমা। টুর্নামেন্টটি শুরু হয় ১৩ আগস্ট ২০১৬, সেখানে মোট ১৪টি দল অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী দিনে মহানগর এক্সপ্রেস বনাম রিভার অব পাইর‍্যাটস হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ২-১ গোলে শেষ হাসি হাসে মহানগর এক্সপ্রেস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, আগের খেলার চাইতে বর্তমানে খেলার অনেক উন্নত হয়েছে। এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের খেলার মান উন্নত হবে এই প্রত্যাশা করি। তাছাড়া এই খেলার মাধ্যমে শরীর ও মনের বিকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের বিকাশ হোক, সংগ্রামে বিকাশ হোক সেটিই আশা করি। এছাড়াও তিনি এই খেলার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে মংসচিং মারমার আদর্শকে ধারণ করে আদিবাসী সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এখানে লেখাপড়া করতে আসছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মনস্বী চাকমা।

আলুটিলায় পর্যটনের নামে ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে পিসিপির বিক্ষোভ

গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলায় পর্যটনের নামে ৭০০ একর ভূমি দখলের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম, রাখাইন স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন সংহতি জানিয়ে সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রিতিশ চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক মিন্টু চাকমা, পলিটেকনিক শাখার সভাপতি মিটুল চাকমা(বিশাল), ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ভ্যালেন্টিনা ত্রিপুরা ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অর্পন ত্রিপুরা, বিএমএসসি'র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ক্যাসিংহ্লা মারমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি সুমন চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস হোড়, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা প্রমুখ এবং সমাবেশে সঞ্চালনা করেন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস, এই ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এখানে রয়েছে ১৩ ভাষাভাষী ১৪টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। সেই ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত তারা সেখানে তাদের ঐতিহ্যগত এবং প্রথাগত ভূমির অধিকার ভোগ করে আসছে। তাই সেই ভূমির সাথে তাদের রয়েছে গভীর সম্পর্ক আর ভালোবাসা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সরকার পর্যটনের নামে ভূমি দখল করে আদিবাসীদেরকে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদের পায়তারা চালাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী।

খাগড়াছড়ির আলুটিলার সেই জায়গাটিতে ৫০০টির অধিক

আদিবাসী পরিবার রয়েছে, যারা স্মরণাতীতকাল থেকে সেখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু সরকার সেইসব আদিবাসী পরিবারকে পর্যটনের নামে উচ্ছেদ করে তাদের প্রথাগত যে ভূমি অধিকার, সেই ভূমি অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে বক্তারা মনে করেন। বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যাকে শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা একটি চুক্তি পেয়েছি, কিন্তু চুক্তি সাক্ষরের ১৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো চুক্তির অধিকাংশ ধারাই বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সে কাঙ্খিত শান্তি ফিরে আসেনি। তাই বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে চেরাগী পাহাড় মোড়ে এসে শেষ হয়। পরে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গায় পর্যটনের নামে ভূমি অধিগ্রহণ বাতিলের জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

খাগড়াছড়ির আলুটিলায় বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপনের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে রাঙামাটি শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা অফিস থেকে শুরু হয়ে বনরূপা হয়ে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক প্রাঙ্গণে এসে বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সদস্য রূপক চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলার সদস্য সৌখিন চাকমা। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, জনসংহতি সমিতি রাঙামাটি জেলার শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উদয়ন ত্রিপুরা প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলার তিনটি মৌজার ৬৯৯.৯৮ একর জমিতে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী ৫১৮ জুম্ম পরিবারকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে ও জীবনজীবিকা বিপন্ন করে সরকার আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপন করতে চলেছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। চুক্তি, প্রথাগত ও আন্তর্জাতিক আইনে উল্লেখ রয়েছে- আদিবাসী সম্মতি ব্যতিত আদিবাসীদের নিজ চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যায় না, তাদের চিরায়ত ভূমি অধিগ্রহণ কিংবা বেদখল করতে পারে না। বক্তাগণ জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের উদ্যোগকে জোর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়।

বক্তারা বলেন, গত ৮০-৯০ দশকে খাগড়াছড়ি বন বিভাগ আলুটিলায় প্রায় ১০০০ একর জুম্মদের চিয়ারত ভূমি বেদখল করে পরিবেশ বিরোধী সেগুন বাগান সৃজন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সল্ট প্রকল্পের নামে ৩০০ একর, খাগড়াছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী সমিতি ৭.০০ একর এবং কতিপয় বাঙালি জুম্মদের চিরায়ত ভূমি বেদখল করে বাগান সৃজন করেছে। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক- এর যোগসাজসে বহু অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। অবৈধভাবে সৃজিত এসব বাগান বাতিল ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে মূল মালিকের নিকট ফেরত প্রদানের দাবি জানায়।

বক্তাগণ বলেন, খাগড়াছড়ি জেলার আলুটিলা এলাকা জুম্মদের একটি এতিহ্যবাহী অঞ্চল। এই এলাকায় জুম্ম আদিবাসীরা শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে। এই আলুটিলা এলাকায় বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপন করা হলে এলাকার বহু গ্রাম উচ্ছেদ হবে এবং হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বক্তাগণ অনতিবিলম্বে আলুটিলা এলাকায় বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপনের নামে জুম্মদের চিরায়ত ভূমি বেদখলের উদ্যোগ বাতিল করার জোর দাবি জানাচ্ছে। সরকার যদি বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপন বাতিল না করে তাহলে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এর কারণে যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারো অশান্ত হয়ে উঠে তার জন্য সরকার দায়ী থাকবে।

উল্লেখ্য যে, সর্বস্তরের জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার আলুটিলা এলাকায় পর্যটন জোন স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল করেছে বলে জানা গেছে।

সংবাদপত্রে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাবে সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসংহতি সমিতিকে জড়িয়ে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এসমস্ত সংবাদ সহজ-সরল পাঠক-জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অবকাশ রয়েছে। এসমস্ত সংবাদে জামায়াত, জঙ্গী গ্রুপ, মায়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপ, অস্ত্র ব্যবসা, চাঁদাবাজি ইত্যাদির সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। জনসংহতি সমিতি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানালেও সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি। নিম্নে এসব প্রেস বিজ্ঞপ্তির অংশ বিশেষ দেয়া গেল-

এক. জামায়াতের সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িয়ে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হেডম্যান মংনু মারমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপজেলাকে উত্তপ্ত করতে নানাভাবে ষড়যন্ত্র, নাইক্ষ্যংছড়িতে জেএসএস'র জামায়াতপ্রীতির অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।' উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবাদে 'সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করছে জেএসএস', 'মায়ানমারের বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে গভীর সখ্যতা রয়েছে জেএসএস নেতাদের', 'বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন ছাড়াও মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে', 'হেডম্যান মংনু অং মারমা, নীলামং মারমা ও সুমেন তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে জেএসএস এর নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জামায়াতের সাথে বন্ধন গড়ে তুলে নানা অবৈধ ও সরকারবিরোধী কর্মকান্ড চালাচ্ছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে জনসংহতি সমিতিকে ও জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের জড়িয়ে প্রকাশিত উক্ত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং উল্লিখিত বক্তব্য ও অভিযোগ 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অসৎউদ্দেশ্য-প্রণোদিত' বলে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, 'বস্তুত জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদেরকে দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার লক্ষে সরকার ও প্রশাসনকে উস্কানি ও প্ররোচনা দেয়ার অপকৌশল হিসেবে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।'

উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'বরঞ্চ উল্লেখ্য যে, স্থানীয় জনগণ জানেন যে, স্থানীয় আওয়ামীলীগের অনেক নেতার মধ্যে অন্যতম মোঃ শফিউল্লাহ ও তসলিম ইকবালসহ আরো অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা মায়ানমার বিদ্রোহী সংগঠনের সাথে ও জামায়াতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং বহিরাগত রোহিঙ্গাদেরকে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যবহার করে আসছেন। উল্লেখ্য, ২৩ নভেম্বর ২০১৪ উক্ত মোঃ শফিউল্লাহ (বর্তমানে যিনি আওয়ামীলীগ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে এক হোটেলে সৌদি আরব ও পাকিস্তান নাগরিক একদল জঙ্গীর সাথে এক গোপন বৈঠক করার সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।' এছাড়া '..উল্লিখিত তসলিম ইকবাল (যিনি আওয়ামীলীগ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শাখার যুগ্ম সচিব) দৈনিক পূর্বকোণের নাইক্ষ্যংছড়ি প্রতিনিধি শামীম ইকবাল চৌধুরী এর আপন ছোটভাই। বস্তুত নিজেদের অপকর্ম আড়াল করা এবং জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও এর নেতাকর্মীদের হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্তৃক দৈনিক পূর্বকোণের ঐ প্রতিনিধিকে দিয়ে এধরনের মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে' প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

দুই. বান্দরবানে নুরুল কবির হত্যা ঘটনায় জনসংহতি সমিতি জড়িয়ে প্রকাশিত ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত 'বান্দরবানে হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন' শীর্ষক সংবাদের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটি তীব্র ও নিন্দা জানিয়েছে। জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, উক্ত সংবাদে 'বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় চাঞ্চল্যকর নুরুল কবির হত্যা মামলায় আদালত যে ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন, ...এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কেউই জনসংহতি সমিতির সদস্য নয় বা জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যই উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নয়। জনসংহতি সমিতির ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করতে, এ ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীনউদ্দেশ্যে এধরনের ভিত্তিহীন ও মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

তিন. বান্দরবানে সিএনজি চালক অপহরণের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'দৈনিক আজাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বান্দরবানে অপহরণের এক ঘন্টা পর সিএনজি চালক উদ্ধার' শিরোনামের সংবাদটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উল্লেখ্য, সংবাদটিতে বান্দরবান প্রতিনিধির বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বান্দরবানে পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের হাতে অপহরণের এক ঘন্টা পর জনতা, পুলিশ ও সেনাসদস্যদের অভিযানে উদ্ধার হয়েছেন সিএনজি চালক মোহাম্মদ রাসেল (২৬)। সন্ত্রাসীরা তার মুক্তির জন্য ২ লাখ টাকা দাবি করেছিল।'

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, 'সংবাদে বর্ণিত ঘটনাটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক নাটক বৈ কিছু নয়। বস্তুত বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ করা ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের হয়রানি করা এবং পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই তাতে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করা হয়েছে।'

চার. 'কাউখালীতে অস্ত্র-গুলি উদ্ধারের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাউখালীতে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার' এবং দৈনিক রাঙামাটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাউখালী থেকে বিদেশী অস্ত্র ও ম্যাগজিন উদ্ধার' শিরোনামের সংবাদ দুটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উল্লেখ্য, দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, '..যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে দেশের সমতল এবং পাহাড়ি জঙ্গী সংগঠনগুলোর কাছে অস্ত্র কেনাবেচার সাথে জেএসএস'র সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে সম্প্রতি গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।...একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গত রবিবার রাতে রাঙামাটির ঘাগড়া-বড়ইছড়ি রাস্তা সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল জেএসএস'র অস্ত্র চোরাচালান দলকে হাতেনাতে ধরার উদ্দেশ্যে রাত ১১ টার দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করে।..' অপরদিকে একই বিষয়ে দৈনিক রাঙামাটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদেও প্রায় হুবহু তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 'জনসংহতি সমিতি বা জেএসএস'কে জড়িয়ে প্রকাশিত উক্ত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কোনভাবে কোন প্রকার জঙ্গী সংগঠন, অস্ত্র কেনাবেচা ও অস্ত্র চোরাচালানকারী দল এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। উক্ত সংবাদ বিবরণীতে জঙ্গী সংগঠন, অস্ত্র কেনাবেচা, অস্ত্র চোরাচালানকারী দল ও মিয়ানমারের বিদ্রোহী সংগঠন এর সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িয়ে যে তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।'

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন, চুক্তি বিরোধী, জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী এবং চরম সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী একটি মহল হীন উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে এবং সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ অধ্যাদেশ জারীর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যেই জনসংহতি সমিতিকে নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।'

বরকলে পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলা সদরে 'শিক্ষা অর্জন হোক জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হোক ছাত্র সমাজের অঙ্গীকার'-এ শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর বরকল উপজেলা শাখার ১৬তম কাউন্সিল এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উপজেলা শাখার ৫ম শাখা সম্মেলন যৌথভাবে জেএসএস থানা শাখা কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিসিপি'র উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলিন চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি ইতিময় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) উপজেলা শাখার সভাপতি উৎপল চাকমা। সম্মেলনে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিধান চাকমা, জনসংহতি সমিতির উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মনোজ চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, মহিলা সমিতির বরকল উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুচরিতা চাকমা, পিসিপির উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষীমন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বরকল উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমা, যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানসপ্রিয় চাকমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। সেই সাথে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ছাত্র ও যুব সমাজকে আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

পিসিপির কাউন্সিলে ইতিময় চাকমাকে সভাপতি, কেতন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সোহেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি উপজেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ

করান পিসিপি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা।

অপরদিকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উপজেলা কমিটিতে সুপ্রীতি চাকমাকে সভাপতি, রিনা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও উরুমিতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত হিল উইমেন্স ফেডারেশন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা।

সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কার্যালয় তল্লাসী ও দলিলপত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলায় সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য কর্তৃক ভোর রাতে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে তালা ভেঙে প্রবেশ করে কার্যালয়ের আলমিরা ভেঙে ফাইলপত্র, সভার কার্যবিবরণী বহি, সমিতির মুখপত্র 'জুম্মবার্তা' নিয়ে যাওয়া এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর, তছনছ ও সমিতির নেতাদের ছবি তছনছ করার ঘটনায় জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৬ সেপ্টেম্বরের প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ঐদিন ভোর রাত ৩:৩০ ঘটিকার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিনাঅনুমতিতে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে প্রবেশ করে আলমিরা ভেঙে সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কমিটির ইউনিয়ন কমিটি সংক্রান্ত ৪টি ফাইল, থানা কমিটি ফাইল, চিঠি প্রেরণ ও গ্রহণ, সদস্য সংগ্রহ, সাংবিধানিক প্রতিবেদন, পেপার কাটিং, স্টক রেজিস্টার, কার্যবিবরণী বহি, সালিশী বৈঠক ইত্যাদি সংক্রান্ত ফাইলপত্র, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সমিতির মুখপত্র 'জুম্মবার্তা'সহ বিভিন্ন প্রকাশনা ও বইপত্র নিয়ে যায়। এছাড়াও কার্যালয়ে টাঙানো জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অন্যান্য নেতাদের ছবি তছনছ করে ফেলে দিয়ে যায়।

আরও উল্লেখ্য যে, গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখও ভোর রাত ৩:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য তালা ভেঙে জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ করে কাগজপত্র তছনছ করে ও কার্যালয়ে টাঙানো বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের ছবি নিয়ে যায়। জনসংহতি সমিতি মনে করে, চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এবং চরম সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ও কায়েমী স্বার্থবাদী একটি মহলের ষড়যন্ত্রেই সেনাবাহিনীর একাংশ কর্তৃক এভাবে বারবার জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখা কার্যালয়ে তল্লাশী ও জিনিসপত্র তছনছ করা হচ্ছে।

পিসিপির উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে মহান শিক্ষা দিবস পালন

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শনিবার মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে "আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত কর, উচ্চ শিক্ষায় ৫% শিক্ষা কোটা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা বৃত্তি বরাদ্দ কর" শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে ডিসি অফিস প্রাঙ্গনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সভাপতি রিটন চাকমা, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা। উক্ত মানববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক নিতীষ চাকমা, রাঙ্গামাটি শহর শাখা সভাপতি পলাশ চাকমা, রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি সুমিত্র চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক মিন্টু চাকমা, রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক দিপেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা সভাপতি আশিকা চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাচিংপ্রু মারমা প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও প্রগতিশীল না হওয়ায় আজ জঙ্গীবাদ সৃষ্টি হচ্ছে, জঙ্গীবাদের মদদ দিচ্ছে। আজ শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করে শিক্ষা বাণিজ্য করা হচ্ছে। শিক্ষার ব্যয় বেড়ে চলেছে, শিক্ষার্থীর বেতন, পরীক্ষার ফিস, বইপত্র, কাগজ-কলম সহ অন্যান্য উপকরণের দাম বেড়ে চলেছে। যার ফলে গরিব শিক্ষার্থীরা অর্থের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। আজ সরকার পার্বত্য এলাকায় প্রাথমিক স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ না করে, পার্বত্য এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নাজুক রেখে উন্নয়নের নামে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় ভূমি দখল করে চলেছে। এছাড়াও পর্যটনের নামে, সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ, বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করে হাজার হাজার একর ভূমি দখল করে চলেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মূল কাজগুলো না করে সরকার আদিবাসীদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে বলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মনে করে।

সভাপতির বক্তব্যে রিটন চাকমা বলেন, পার্বত্য এলাকায় আজ প্রাইমারী স্কুলের বেহাল দশা। তাছাড়া পার্বত্য এলাকা প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় এখানে শিক্ষকরা বর্গা প্রথার মাধ্যমে শিক্ষাদান করছেন। এতে শিশুরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া

প্রাথমিক শিক্ষা স্ব-স্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে না হওয়ায় শিশুরা দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এতে অনেক শিশু প্রাইমারী থেকে ঝরে যাচ্ছে। তাই এই এলাকায় শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান সহ সব কিছু নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস সঠিকভাবে পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরতে হবে।

পরিশেষে মানববন্ধন থেকে আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, উচ্চ শিক্ষায় ৫% শিক্ষা কোটা আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা, সমগ্র দেশে ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা চালু করা, শিক্ষার সকল উপকরণের ব্যয় কমানো, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি চালু করা, জাতীয় বাজেটের ২৫% শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা, অতিদ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তাবায়ন করা ইত্যাদি দাবিগুলো তুলে ধরা হয়।

সেনা-পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা অফিস তল্লাশী ও মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১১:০০ টার দিকে বান্দরবান সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য ও পুলিশ বিনা অনুমতিতে বান্দরবান জেলা সদরে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখা কার্যালয়ে তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশী অভিযানের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটি তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমার স্বাক্ষরিত ১৯ সেপ্টেম্বরের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, এসময় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সমিতির কার্যালয়ে থাকা আলমিরাসহ আসবাবপত্র ভেঙে দেয় এবং কার্যালয়ের বিভিন্ন দলিলপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। যাওয়ার সময় ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিপিইউ, ইন্টারনেটের মডেম, কার্যালয়ের ফাইলপত্র, একটি ডিজিটাল ক্যামেরা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী তথাকথিত তল্লাশী চালিয়ে রাত ১২:০০ টার দিকে সেনা ও পুলিশ সদস্যরা চলে যায়।

অপরদিকে একই তারিখে রাত ১১:৩০ টায় বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় জনসংহতি সমিতির লামা উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসামের বাড়িতেও তল্লাশী চালিয়েছে আলীকদম সেনা জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল সেনা ও পুলিশ সদস্য। এসময় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা স্বপন আসামের বাড়িতে থাকা জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির বিভিন্ন দাপ্তরিক কাগজপত্র ও বইপত্র নিয়ে যায়। সমিতির লামা থানা কমিটির বর্তমানে কোন কার্যালয় না থাকায় স্বপন আসামের বাড়িতেই উক্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়। সেনা ও পুলিশ সদস্যরা যাওয়ার সময় 'সংগঠনের কাগজপত্র ব্যতীত কোন মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়নাই' মর্মে স্বপন আসামের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পত্র নিয়ে যায়। এছাড়া আরও বলে যায় যে, সেনাক্যাম্পের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান করলে যেন তাদের অনুমতি নেয়া হয়।

বলাবাহুল্য, দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত বান্দরবান ও আলীকদম জোনের সেনাবাহিনী কর্তৃক এভাবে জনসংহতি সমিতির কার্যালয়ে তালা ভেঙে প্রবেশ করা এবং কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ও কাগজপত্র তছনছ করা বা নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অগণতান্ত্রিক ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে ও বান্দরবানের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে।

চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এবং চরম সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, অগণতান্ত্রিক ও কায়েমী স্বার্থবাদী একটি মহলের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার স্বার্থে স্থানীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক এভাবে তল্লাশী অভিযান, জনসংহতি সমিতির মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও দলিলপত্র তছনছ করে দেয়া ও কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। অচিরেই বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির উপর এধরনের অন্যায় তল্লাশী অভিযান, কার্যালয় ভাঙচুর, দলিলপত্র নিয়ে যাওয়া, দমন-পীড়ন, হয়রানি বন্ধ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ নিরীহ জুম্মদের তল্লাসী ও নির্যাতনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটি বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়িনের বেতছড়া সেনা ক্যাম্পের সদস্যদের কর্তৃক তল্লাশী অভিযানের নামে গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ নিরপরাধ ও নিরীহ জুম্মদের নির্যাতনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে এধরনের অগণতান্ত্রিক সেনা তল্লাশী অভিযান ও নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা

কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এধরনের ঘটনা চরম মানবাধিকার লংঘনের শামিল যা গভীর উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত ১:৫০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়িনের বেতছড়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য তারাছা ইউনিয়নের নোয়াপতং মুখ পাড়ায় গিয়ে অভিযানের নামে পাড়ায় তল্লাশী চালিয়ে পাড়ার কার্বারী গং মুই উ মারমা (৫৫), জনসংহতি সমিতির নোয়াপতং মুখ গ্রাম কমিটির সদস্য ক্যগ্রা অং মারমা (৪৫) ও মংয়ই উ মারমা (৪০)-কে মারধর করে শারীরিকভাবে জখম করেছে। এই তল্লাশী ও মারধর করার সময় সেনাসদস্যদের সাথে মুখোশধারী কিছু লোকজনকেও দেখা গেছে।

বান্দরবানে জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পিসিপির বিক্ষোভ

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা কর্তৃক বান্দরবানে জেএসএস ও পিসিপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক সকল মামলা প্রত্যাহার করা ও বেআইনীভাবে গ্রেফতারকৃত পিসিপি নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশটি ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়।

সমাবেশ থেকে বক্তারা বলেন, বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বামংচিং মারমাকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার কার্যালয়ে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গভীর রাতে তল্লাশী অভিযান চালানো হয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে শূন্য করে দেওয়ার জন্য জেএসএসের নেতাকর্মীদের উপড় মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের উপরও শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। সর্বোপরি, বান্দরবান জেলা জেএসএস ও পিসিপি নেতাদের বিদ্ধদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বান্দরবানে জেএসএসের নেতৃত্বকে দুর্বল করে দেওয়ার হীনমানসিকতা নিয়ে প্রশাসন প্রতিনিয়ত মিথ্যা মামলা, হামলা, তল্লাশী অভিযান, ভূমি বেদখলের মত ঘৃণ্য কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে বান্দরবানের আপামর জনসাধারণ গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের মধ্যে রয়েছে। অচিরেই বান্দরবানে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের উপর এ ধরণের অন্যায় তল্লাশী অভিযান, কার্যালয় ভাঙচুর, দলিলপত্র নিয়ে যাওয়া, দমন-পীড়ন হয়রানি বন্ধ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

পিসিপির বান্দরবানের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বাঅংচিং মারমার নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে পিসিপির বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে "বান্দরবানে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত পিসিপির বান্দরবান জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বাঅং চিং মারমার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং বান্দরবানে অব্যাহতভাবে সেনা-পুলিশের অভিযান, ধরপাকড়, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা দায়ের প্রতিবাদে" বিক্ষোভ মিছিল ও রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক অধিরাম চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উদয়ন ত্রিপুরা বলেন বান্দরবান জেলা একটি সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক জেলা নামে আখ্যায়িত করা হয় কিন্তু বর্তমানের আওয়ামীলীগের টেন্ডারবাজি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা মামলা, ভূমি বেদখল, গণবিরোধী কার্যকলাপের কারণে আজ জনগণ দিশেহারা। জনগণ প্রতিবাদ করতে গেলে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এই দেশে রাজনীতি করার সবার অধিকার

রয়েছে। তাই জেএসএস এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বান্দরবানে আওয়ামীলীগ কোন দলকে রাজনীতি করতে দিচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আওয়ামীলীগ কর্তৃক ৪০ জনের অধিক জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মী এবং পিসিপির কর্মীকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মধ্যরাত ১২:৩০ টার সময় পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ও কলেজ ছাত্র বাঅং চিং মারমাকে গ্রেফতার করেছে। এর পর পুলিশ পাশের ১০-১৫ ছাত্রকে আইডি কার্ড দেখাতে বাধ্য করে এবং বিভিন্ন হয়রানি মূল কাজ করে ছেড়ে দেয়। তাই আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের যত আঘাত করা হবে তত বেশি শক্ত অবস্থান নিয়ে আমরা মাঠে নামবো আর সেভাবে দলকে শক্তিশালী করবো।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা বলেন, বাংলাদেশে কী আওয়ামীলীগ ছাড়া কোন দলের রাজনীতি করার অধিকার নেই? পিসিপি, জেএসএস বা অন্য দল রাজনীতি করলে মিথ্যা মামলা দেওয়া হবে এমন কাজ দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলবেন অন্য দিকে জনগণের অধিকার খর্ব করবেন, একদলীয় শাসন কায়েম করবেন এটা মেনে নেওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে একদলীয় শাসন কোনদিন দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনে না এবং এর পরিণতিও ভালো ফল আনে না।

এছাড়াও সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, হিল উইমেনস ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা প্রমুখ। পরিশেষে সমাবেশে অবিলম্বে বাঅং চিং মারমাকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান ও তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা; বান্দরবানে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা ও তল্লাশি বন্ধ করা এবং রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা ইত্যাদি দাবি তুলে ধরা হয়।

পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার ২৪তম সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান করি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার ২৪তম কাউন্সিল ও সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমার সঞ্চালনায় এবং ঢাকা মহানগরের সভাপতি কেরিংটন চাকমার সভাপতিত্বে জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি, তথ্য ও প্রচার বিভাগের অন্যতম সদস্য দীপায়ন খীসা। আরও উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তুহিন কান্তি দাশ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দীপায়ন খীসা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন (সংশোধনী) পাস এবং মহান সংসদে এম এন লারমার শোক প্রস্তাব সরকারের দান বা অনুদান নয়, এটা পার্বত্যবাসীর তথা জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অনেক এমপি মনোনীত হওয়ার পরেও কেউ বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করেনি। কিন্তু জেএসএস থেকে এমপি হয়েই ঊষাতন তালুকদার বিষয়টি সংসদের দৃষ্টিগোচরে আনেন এবং পাস করতে চাপ প্রয়োগ করেছেন, সেখানে আন্দোলন করতে হয়েছে। তাই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সংগ্রাম করে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।

শেষে কেরিংটন চাকমাকে সভাপতি এবং নিপন ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও টনক তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা মহানগর ২৫তম কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক জেমসন আমলাই।

সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ

গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ সকাল ১০ টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে সমিতির রাজস্থলী থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে বান্দরবানে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় জড়িতকরণের প্রতিবাদে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের করে বনরূপা ঘুরে এসে রাঙ্গামাটির ডিসি অফিস দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে একই বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়েছে।

সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ্মলোচন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা ও যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিনয় সাধন চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বান্দরবানের কোন মামলার আসামী না হওয়া সত্ত্বেও এবং বিনা ওয়ারেন্টে সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে বান্দরবানের পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার করে পরে মিথ্যাভাবে চাঁদাবাজি মামলায় জড়িত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং ঘটনাটি গভীর ষড়যন্ত্রমূলক ও উস্কানিমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করেন।

নেতৃবৃন্দ জেএসএস, যুব সমিতি ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত স্মারকলিপিতে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চুকে নিঃশর্ত মুক্তিসহ তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলাসমূহ প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নায়ারণ লারমা'র ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এ্যালবাম

শ্রদ্ধাঞ্জলি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

শ্রদ্ধাঞ্জলি
জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল
(জাক)
রাঙ্গামাটি

‘মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজ যে সংবিধান এই মহান গণপরিষদে গৃহীত হবার শেষ পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংবিধানে বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ–কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে ‘সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই’। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।

আসুন, শপথ করি, যেন আমাদের চেষ্টা সফল হয়, যেন শোষণহীন সমাজ বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর যেন রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান না হয়, ‘আমাদের দাবি মানতে হবে’ আর যেন মিছিল না হয়, ‘আমাদের দাবি মানতে হবে’, ‘সংগ্রাম চলবে, সংগ্রাম চলবেই’ বলে। সেই অবস্থা আর যেন না হয়। আমরা যেন আমাদের জন্মভূমি গড়ার কাজে ভালো করে মনোনিবেশ করতে পারি।’

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে
১০ নভেম্বর ২০১৬ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল pcjss.org@gmail.com. web : www.pcjss-cht.org